হযরত শাহাবুদ্দিন উমর সুহরাওয়ার্দি রাহিমাহুল্লাহর

আওয়ারিফুল মা'আরিফ থেকে

তুহফাতুস সালিকীন

ইঞ্জিনিয়ার আজিজুল বারী

খানক্বায়ে আমীনিয়া-আসগরিয়া

হযরত শাহাবুদ্দিন উমর সুহরাওয়ার্দি রাহিমাহুল্লাহর

আওয়ারিফুল মা'আরিফ থেকে

তুহফাতুস সালিকীন

ইঞ্জিনিয়ার আজিজুল বারী

প্রকাশকাল: ১০/৭/২০১৯

বিশেষ ইন্টারনেট সংস্করণ

খানক্বায়ে আমীনিয়া-আসগরিয়া গবেষণা বিভাগ

আলী সেন্টার, সুবিদবাজার, সিলেট, বাংলাদেশ।

সূচিপত্র

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى

প্রাক কথন

আলহামদুলিল্লাহ! অনেকদিনের আকাঙ্ক্ষা ছিলো সুহরাওয়ার্দিয়া তরীকার প্রতিষ্ঠাতা হযরত শাহাবুদ্দিন উমর সুহরাওয়ার্দি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি প্রণীত বিখ্যাত কিতাব 'আওয়ারিফুল মা'আরিফ' এর বঙ্গানুবাদ পাঠকদের হাতে তুলে দেওয়ার। মূল গ্রন্থটি ফার্সি ভাষায় রচিত। অনেক অনুসন্ধানের পর লেফটেন্যান্ট-কর্ণেল এইচ. উইলবারফোর্স ক্লার্ক কর্তৃক আংশিক অনূদিত একটি ইংরেজি সংস্করণের সন্ধান পাই ইন্টারনেটে। সুতরাং ডাউনলোড করে অনুবাদের কাজে লেগে যাই। তবে এ অনুবাদটি পূর্ণাঙ্গ নয়- বরং লেখকের রচনার 'চুম্বকাংশ' বলা যায়। এর কারণ হলো, পূর্ণাঙ্গ কোনো ইংরেজি অনুবাদ আমি খুঁজে পাই নি। পূর্ণাঙ্গ না হওয়ার কারণেই বর্তমান গ্রন্থের নামকরণ করেছি 'হযরত শাহাবুদ্দিন উমর সুহরাওয়ার্দি রাহিমাহুল্লাহর আওয়ারিফুল মা'আরিফ থেকে- তুহফাতুস্ সালিকীন'। আমি আশাবাদী, তরীকতপন্থীরা তো বটেই- সাধারণ পাঠকরাও এই গুরুত্বপূর্ণ বইটি থেকে উপকৃত হবেন।

হযরত শাহাবুদ্দিন সুহরাওয়ার্দি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এই গ্রন্থে সুফিতত্ত্ব তথা তাসাওউফ ও সুলুকের ওপর বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। শায়খ, মুরীদ, খানক্বাহ, সফর, সামা', খিরক্বা, খিলওয়াত, ইলম, মা'রিফাত, হাল, তাওহিদ, ইলমে ক্বিয়াম, ইলমুল ইয়াক্বিন, ইলমে হাল, মা'রিফাতে রুহ, নফস, জামা', তাজাল্লি, ওয়াক্ত, ওয়াজদ, শুহুদ, তাজরিদ, তাফরিদ, মাহু, ইসবাত, তালউইন, আওরাদ, যুহদ, ফক্বর, তাজাররুদ, তাওয়াক্কুল, রিদ্বা, মুহাব্বাত, শওক্ব, কব্জ, ফানা, বাকা ইত্যাদি তাসাওউফশাস্ত্রের বিভিন্ন বিষয়ের ওপর গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাদি গ্রন্থটিতে তুলে ধরেছেন। হযরত আবুল কাসিম কুশাইরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির

‘রিসালাত’ এবং ইমাম গাযালী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির ‘ইহইয়া উলূমিদ্দীন’ গ্রন্থদ্বয়ের পর তাসাওউফের ওপর এরূপ সূক্ষ্ম আলোচনাসর্বস্ব গ্রন্থ আমার চোখে পড়ে নি।

গ্রন্থ প্রকাশনার সঙ্গে জড়িত সবাইকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আল্লাহ তা’আলা সবাইকে তাঁর পছন্দসই রাস্তার ওপর ক্বায়েম রাখুন। তিনি যেনো এই গ্রন্থটি রোজ কিয়ামতে আমার জন্য নাযাতের ওয়াসিলা বানিয়ে দেন। ভুল-ত্রুটি যা-ই আছে সবকিছুর জন্য আমি দায়ী। আমি আল্লাহ তা’আলার দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আশাকরি পাঠকরাও আমার দিকে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টি দেবেন এবং দু’আর সময় এ অধমকে স্মরণ করবেন।

ইঞ্জিনিয়ার আজিজুল বারী
খানক্বায়ে-আমীনিয়া-আসগরিয়া গবেষণা বিভাগ
সুবিদবাজার পয়েন্ট, সিলেট।
৪ এপ্রিল ২০১৭ ঈসায়ী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

গ্রন্থকার শাহাবুদ্দিন উমর সুহরাওয়ার্দি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি: জীবন ও কর্ম

ইমামুত তারীকাত, সুলতানুল সুহরাওয়ার্দ শাহাবুদ্দিন আবু হাফস বিন মুহাম্মদ সুহরাওয়ার্দি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ছিলেন সুহরাওয়ার্দিয়া সুফি তরীকার প্রতিষ্ঠাতা। 'মুহাদ্দিসে বাগদাদী' হিসাবেও তাঁর খ্যাতি ছিলো। তবে হযরতের জন্ম হয় বর্তমান ইরানের জানযানের নিকটস্থ 'সুহরাওয়ার্দ' নামক একটি জনপদে। হিজরি ৫৩৯ [১১৪৫] সনের রজব মাসের শেষের সপ্তাহ থেকে শা'বানের প্রথম ক'দিনের মধ্যে তাঁর জন্ম হয় বলে অধিকাংশ ইতিহাসবিদের ধারণা।

তাঁর পূর্বপুরুষ ছিলেন প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদ্বিআল্লাহু আনহু। 'মুনাক্বিবে গাউসিয়া' নামক কিতাবে আছে, প্রথমত তাঁর পিতামাতা নিঃসন্তান ছিলেন। অবশেষে কোনো একদিন হযরতের মাতা হযরত আবদুল কাদির জিলানী [মৃ. ৫৬১ / ১১৬৭] রাহমাতুল্লাহি আলাইহির খানক্বায় যেয়ে উপস্থিত হলেন। একটি সুসন্তান লাভের জন্য আল্লাহর দরবারে দু'আ করতে আবদার জানালেন শায়খের নিকট। দু'আ শেষে শায়খ জিলানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি খুব উত্তম একটি ছেলে-সন্তান লাভের ভবিষ্যদ্বাণী করলেন। অন্য বর্ণনায় জানা যায়, তিনি এটাও বলেছিলেন, 'তোমার এ সন্তানের নাম রাখবে শাহাবুদ্দিন উমর'।

শিক্ষাজীবন ও তরীকতের রাস্তায় ভ্রমণ

হযরত শাহাবুদ্দিনের প্রাথমিক শিক্ষা শুরু হয় নিজের গৃহে। এরপর নিজের চাচা হযরত জিয়াউদ্দীন সুহরাওয়ার্দি [মৃ. ৫৬৩ / ১১৬৫] রাহমাতুল্লাহি আলাইহির মতো বালক বয়সেই তিনি শিক্ষার্থী হিসাবে বাগদাদে চলে আসেন। এখানে এসে তিনি কুরআন, হাদিস, তাফসির, ফিক্হ ইত্যাদি জাহিরী ইলমের ওপর উচ্চতর অধ্যয়ন করেন সে যুগের প্রসিদ্ধ কয়েকজন শিক্ষাগুরুর নিকট। এরপর তাঁর সুযোগ্য চাচার নিকট তরীকতের সবকও গ্রহণ করেন। তিনি শায়খ আবদুল কাদির জিলানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির হাতেও বাইআত গ্রহণ করেছিলেন। পরে তিনি তাঁর নিকট থেকে হিজরি ৫৬০ / ১১৬২ ঈসায়ী সনে কাদিরীয়া তরীকতের খিলাফত লাভে ধন্য হন। 'ক্বালা'ইদুল জাওয়াহির' কিতাবে আছে হযরত জিলানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর এই প্রিয় মুরীদকে বললেন: 'হে উমর! ইরাকের শেষ যুগের শায়খ হিসাবে তুমি সুপরিচিত হয়ে ওঠবে'। হযরতের এই ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে পরিপূর্ণ হয়েছিল।

উক্ত দু'জন প্রসিদ্ধ অলিআল্লাহ ছাড়াও শাহাবুদ্দিন রাহমাতুল্লাহি আলাইহি সমসাময়িক যুগের আরো অনেক মাশাইখে আজমের সুহবত লাভে ধন্য ও উপকৃত হন। ইরাকের আবাদান নামক স্থানে অবস্থান করে সেখানকার কয়েকজন 'আবদালের' নিকট থেকেও তরীকতের অনেক গোপন রহস্যাবলী সম্পর্কে তিনি জ্ঞানার্জন করেন। ঐ সময় হযরত খিজির আলাইহিস্সালামের সাক্ষাৎ লাভ করেছিলেন বলেও বিভিন্ন কিতাবে উল্লেখিত হয়েছে।

হযরত শাহাবুদ্দিন রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বেশ কয়েকবার পবিত্র হজ্জ পালন করেন। হজ্জ উপলক্ষে মক্কা মুকাররমায় সর্বশেষ ভ্রমণে যান হিজরি ৬২৮ / ১২৩১ সনে। এই সফরেই মক্কা শরীফে তিনি সাক্ষাৎ লাভ করেন মিশরের সুফি-দরবেশ হযরত শায়খ আবু হাফস উমর বিন আলী ওরফে ইবনুল ফারিদ [মৃ. ৬৩২ / ১২৩৫] রাহমাতুল্লাহি আলাইহির সঙ্গে। এ সময় ইবনুল ফারিদের সফরসঙ্গী দু'জন ছেলে-সন্তান শায়খ কামালুদ্দীন মাহমুদ ও শায়খ আবদুর রহমান শাহাবুদ্দিন রাহমাতুল্লাহি আলাইহির হাতে বাইআত গ্রহণ করেন। পরবর্তীতে উভয়ে হযরতের নিকট থেকে তরীকতের খিলাফত লাভে ধন্য হন।

হযরতের চাচা জিয়াউদ্দীন সুহরাওয়ার্দি রাহমাতুল্লাহি আলাইহির একটি খানক্বাহ ছিলো। জিয়াউদ্দীন সাহেব হিজরি ৫৬৩ / ১১৬৫ সনে ইন্তিকাল করেন। তখন এই খানক্বার দায়িত্ব নেন শাহাবুদ্দিন সাহেব। খানক্বায় একটি ধর্মীয় মুসাফিরখানা ছিলো। হযরত আরো তিনটি নতুন মুসাফিরখানা প্রতিষ্ঠা করেন। এগুলোর নামকরণ করা হয়: 'রিবাতে নাসিরী', 'রিবাতে বিস্তামী' ও 'রিবাতে মামূনিয়া'। হযরতের মুরীদান এসব রিবাতে অবস্থান করতেন।

সাধারণ মুসলমানদের নিকট হযরত শাহাবুদ্দিন উমর সুহরাওয়ার্দি রাহমাতুল্লাহি আলাইহির জনপ্রিয়তা অচিরেই ছড়িয়ে পড়ে। সে যুগের মুসলিম বিশ্বে তাঁর সুনাম বিস্তার লাভ করে খুব দ্রুত। দলে দলে লোকজন তাঁর খানক্বায় উপস্থিত হয়ে বাইআত গ্রহণ করতে থাকেন। তাঁর আধ্যাত্মিক উচ্চতর মাক্বাম সম্পর্কে একটি বর্ণনা একজন সুফির প্রশ্ন ও এর জবাব থেকে পাওয়া যায়। হযরতের নিকট প্রেরিত ঐ চিঠিতে সুফি সাহেব প্রশ্ন করলেন: "শায়খ! আমি নফল ইবাদত ছেড়ে দিয়েছি। আমি নিজেকে অলস হিসাবে দেখতে পাচ্ছি। ইবাদত করলে আমার মনে গরিমার সৃষ্টি হয়। আমি এখন কোনটি করবো?"

হযরত অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত ও সুস্পষ্ট ভাষায় জবাব লিখলেন: ''ইবাদত করতে থাকো এই বলে, হে আল্লাহ আমাকে গৌরববোধ থেকে মুক্ত ও মাফ করে দাও।''

শাইখুশ শুয়ূখ উপাধিতে ভূষিত

হযরত শাহাবুদ্দিন রাহমাতুল্লাহি আলাইহি জীবনের অধিকাংশ সময় বাগদাদে কাটিয়েছেন। তখনকার খলিফা নাসির তাঁকে খুব সম্মান করতেন। একদা তাঁকে 'শাইখুশ শুয়ূখ' উপাধিতে ভূষিত করেন। সমগ্র মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে হযরতের নিকট মানুষ বিভিন্ন বিষয়ে প্রশ্ন করে পত্রাদি লিখতো। প্রায়ই মুসলিম বিভিন্ন জনপদের শাসকদের মধ্যে শান্তিরক্ষার্থে তিনি একজন সফল দূত হিসাবে কাজ করতেন। সমকালীন ইতিহাসবিদ ইবনে খালিক্কান [হিজরি ৬০৮-৬৮১] তাঁর সম্পর্কে মন্তব্য করেন: ''তাঁর শেষের জীবনে সমপর্যায়ের কেউই জীবিত ছিলেন না।'' প্রত্যেকদিন নজরানা হিসাবে অনেক অর্থকড়ি আসতো ধনীদের নিকট থেকে। তিনি এগুলো গরীবদের মধ্যে বন্টন করে দিতেন। বিরাট অঙ্কের অর্থ-কড়ি প্রাপ্তির পরও তিনি খুব সাধারণ জীবন-যাপন করতেন। এমনকি হযরতের ইন্তিকালের পর দেখা গেলো কাফন-দাফনের জন্য জরুরী টাকা-পয়সাও তিনি রেখে যান নি।

সমসাময়িক মাশাইখবৃন্দের প্রতি শ্রদ্ধা

হযরত শাহাবুদ্দিন উমর সুহরাওয়ার্দি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি অন্যান্য তরীকা ও এদের প্রতিষ্ঠাতাদের প্রতি খুব শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। সমসাময়িক যুগেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বেশ ক'টি প্রসিদ্ধ সুফি তরীকা, যেমন: হযরত আবু ইসহাক শামী [মৃ. ৩২৯ / ৯৪১] রাহমাতুল্লাহি আলাইহি কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ও খাজা মুঈনুদ্দীন চিশতী [মৃ. হিজরি ৬৩৩ / ১২৩৫] রাহমাতুল্লাহি আলাইহি কর্তৃক ব্যাপকভাবে প্রচার-প্রসারিত চিশতিয়া তরীকা, হযরত নাজমুদ্দীন কুবরা [মৃ. ৬১৮ / ১২৬৫]

রাহমাতুল্লাহি আলাইহি কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত কুবরাবিয়া / ফিরদাউসিয়া তরীকা, শায়খ জালালুদ্দীন রুমী [মৃ. ৬৬৪ / ১২৬৫] রাহমাতুল্লাহি আলাইহি কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মাওলাবিয়া তরীকা ও তাঁর শায়খ হযরত আবদুল কাদির জিলানী [মৃ. হিজরি ৫৬১ / ১১৬৭] রাহমাতুল্লাহি আলাইহি কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত কাদিরিয়া তরীকা। চিশতিয়া তরীকার বিখ্যাত শায়খ, হযরত কুতুবুদ্দীন বখতিয়ার কাকী [মৃ. ৬৩৪ / ১২৩৫] রাহমাতুল্লাহি আলাইহির প্রধান খলীফা হযরত ফরিদুদ্দীন মাসউদ গঞ্জেশকর [মৃ. ৬৬১ / ১২৬৩] রাহমাতুল্লাহি আলাইহি হযরত শাহাবুদ্দিন রাহমাতুল্লাহি আলাইহির বাগদাদের খানক্বায় ভ্রমণে যান ও বেশ কিছুদিন অবস্থান করেন।

ইমাম ইয়াফিঈ [মৃ. ৬৭৮ / ১৩৬৭] লিখেছেন, একদা শায়খুল আকবর হযরত ইবনুল আরাবি [মৃ. ৬৩৮ / ১২৪০] রাহমাতুল্লাহি আলাইহি হযরত শাহাবুদ্দিন রাহমাতুল্লাহি আলাইহির সাক্ষাৎ পান। উভয়ে শুধুমাত্র একে অন্যের চোখ পানে কিছুক্ষণ তাকালেন, কেউ কিছু বললেন না। পরবর্তীতে কেউ একজন হযরত আরবি রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে শাহাবুদ্দিন সাহেব সম্পর্কে প্রশ্ন করলেন, তিনি জবাব দিলেন, ''তিনি ঐ ব্যক্তি যার মাথা থেকে পায়ের অঙ্গুলি পর্যন্ত রাসূলের সুন্নাতে পরিপূর্ণ।'' অপরদিকে শায়খ সুহরাওয়ার্দি রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে যখন কেউ শায়খ আরবি সাহেব সম্পর্কে প্রশ্ন করলেন, তিনি জবাব দিলেন, ''তিনি হচ্ছেন মা'রিফাতের মহাসাগর।'' 'রিসালা ইক্ববাদিয়া' নামক কিতাবে আছে, হযরত সাদ উদ্দীন হামুইয়া [মৃ. ৫৬০ / ১২৫২] রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে কেউ প্রশ্ন করলেন, ইবনুল আরবি সাহেব সম্পর্কে মন্তব্য করুন। তিনি জবাব দিলেন, ''তাঁকে একটি উত্তাল মহাসমুদ্রের সাথে তুলনা করা যায় যার বিস্তৃতি অসীম।'' হযরত শাহাবুদ্দিন সাহেব সম্পর্কে অনুরূপ প্রশ্নের জবাবে বললেন, ''রাসূলের ইত্তিবার নূর দ্বারা তাঁর কপাল এমনভাবে আলোকিত আছে যার তুলনা নেই।''

তাঁর প্রেষণায় আকৃষ্ট হয়ে যুগের অসংখ্য মাশাইখ বাগদাদের খানক্বায় হাজির হয়েছেন সুহবত লাভ করতে। তাঁর খলিফারা পৃথিবীর প্রত্যন্ত অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েন ও ইলমে তাসাওউফের জ্ঞান ও আত্মশুদ্ধির রাস্তার বিকাশ ঘটান। 'আখবারুল আখঈয়ার ফী আসরারুল আবরার' কিতাবে আছে, হযরত নিজেই বলেন, 'আমার অনেক খলিফা ভারতবর্ষে অবস্থান করছেন।' ধারণা করা হয়, ২০ জনের মতো তাঁর সুযোগ্য খলিফার পদধূলিতে ভারতবর্ষের জমি ধন্য হয়েছে। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ক'জন হলেন: মীরে দিল্লী শাইখুল ইসলাম সায়্যিদ নূরুদ্দীন মুবারক গজনবী [মৃ. ৬৩২ / ১২৩৪], হযরত বাহাউদ্দীন আবু মুহাম্মদ জাকারিয়া মুলতানী [মৃ. ৬৬১ / ১২৬২], শায়খ কাজি হামিদুদ্দীন মুহাম্মদ বিন আতাউল ফারুকী নাগৌরী [মৃ. ৬৪৩ / ১২৭৪], শায়খ জালালুদ্দীন মুহাম্মদ তাবরিযী [মৃ. ৬৪২ / ১২৪৪], শায়খ নূহ বাখারি সিন্ধী, শায়খ সাইয়্যিদ আহমদ অরফে সুলতান সাখি সারওয়ার [মৃ. ৫৭৭ / ১১৮১], শায়খ জিয়াউদ্দীন রুমী [মৃ. ৭২১ / ১৩২৩], শায়খ মজদ্দুদ্দীন মুহাম্মদ হাজি জাযেরমি [মৃ. ৬২৩ / ১২২৬], শামসুল আরিফীন শাহ তুর্কমান বাইয়াবানী দেহলবী [মৃ. ৬৩৭ / ১২৪০], শায়খ সাইয়্যিদ শিহাবুদ্দীন বিন মুহাম্মদ হুসাইনী অরফে 'জগৎজ্যোতি' [মৃ. ৬৬৬ / ১২৬৭-৬৮ - তিনি ছিলেন হযরত শরফউদ্দীন ইয়াহইয়া মানিয়ারী [মৃ. ৭৮২ / ১৩৮১] রাহ. এর দাদা], শায়খ সাইয়্যিদ মঈযুদ্দীন সান্দাইলিবী আবদাল, শায়খ সাইয়্যিদ ইলালুদ্দীন জাওয়ারী, শায়খ শরফুদ্দীন ইরাকী, শায়খ মুহাম্মদ ইব্রাহিম আনসারী, শায়খ আহমদ বিন জৈন মুলতানী, শায়খ সুলাইমান বিন আবদুল্লাহ আব্বাসী হাসিমী প্রমুখ রাহমাতুল্লাহি আলাইহিম মহাত্মন।

তাঁর আরো কয়েকজন খলিফা মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন এলাকায় ইলমে তাসাওউফের খিদমাত করে গেছেন। এদের মধ্যে প্রসিদ্ধ ক'জন হলেন, শায়খ মুসলেউদ্দীন সাদী সিরাজী [মৃ. ৬৯১ / ১২৯২], শায়খ নাযিবুদ্দীন আলী বিন বুযগুশ

সিরাজী [মৃ. ৬৭৮ / ১২৭৯], শায়খ শামসুদ্দীন সাফি সিরাজী, শায়খ সাইয়্যিদ মুহাম্মদ সুজাহ মাশাদী, শায়খ শাহ সরফুদ্দীন মাহমুদ বিন হুসাইন তুসতরী, শায়খ মুহাম্মদ ইয়ামনী, শায়খ আহমদ দামেস্কী, শায়খ নাজমুদ্দীন তাফলিসী [ইরাক], শায়খ সাইয়্যিদ মুহাম্মদ বাগদাদী, শায়খ রশীদুদ্দীন আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ বিন আবুল কাসিম মারক্কি সুফি বাগদাদী, শায়খ আহমদ ফারুকী কাবুলী, শায়খ ইযজউদ্দীন আবুল আব্বাস আহমদ ফারুকী প্রমুখ রাহমাতুল্লাহি আলাইহিম মাশাইখে আজম।

পুত্রসন্তান

এ পর্যন্ত জানা, হযরতের তিনজন পুত্রের নাম হলো শায়খ জৈনুদ্দীন, শায়খ ইমাদুদ্দীন মুহাম্মদ ও শায়খ জামালুদ্দীন রাহমাতুল্লাহি আলাইহিম। দ্বিতীয়োক্ত ব্যক্তি হযরতের খলিফা ছিলেন। সর্বশেষ হজ্জের সফরে [৬২৮ / ১২৩১] তিনি তাঁর সফরসঙ্গী ছিলেন।

রচনা

হযরত শাহাবুদ্দিন রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বেশ কয়েকটি গ্রন্থের রচয়িতা। জার্মান প্রাচ্যবিদ ব্রকেলম্যান তাঁর ‘গেসিসস্টি ডার আরাবিশেন লিটারেচার’ নামক গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, হযরত শাহাবুদ্দিন সাহেব মোট ২১টি গ্রন্থের প্রণেতা। এর মধ্যে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ গ্রন্থটির নাম হলো ‘আওয়ারিফুল মা’আরিফ’ [ঐশি জ্ঞানের প্রাচুর্য] । এটি যুগ যুগ ধরে সুফি সম্প্রদায় ও সাধারণ তাসাওউফপন্থীদের নিকট সমাদৃত ও বহুলপঠিত হয়ে আসছে। এটা সুহরাওয়ার্দিয়া তরীকার গাইডবইও বটে। মক্কা মুকাররমায় অবস্থানকালে তিনি এটি রচনা করেন। তিনি বলেছেন, “যে মুহূর্তে আমি লিখতে যেয়ে সমস্যার সম্মুখীন হয়েছি, তখনই আল্লাহর দিকে নিজেকে রুজু করেছি ও বাইতুল্লাহর তাওয়াফ সেরেছি।” গ্রন্থটি আরবি ভাষায়

রচিত। তবে যুগ যুগ ধরে বিভিন্ন ভাষায় এটি অনূদিত হয়ে আসছে। গ্রন্থটি সম্পর্কে মন্তব্য করতে যেয়ে সুহরাওয়ার্দিয়া তরীকার শাইখুল মাশাইখ হযরত জালালুদ্দীন হুসাইন বিন আহমদ কবির [মৃ. ৭৮৫ / ১৩৮৪] রাহমাতুল্লাহি আলাইহি- যিনি মাখদুমে জাহানগাশ্ত নামে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ লিখেছেন: "যদি কারো কোনো মুর্শিদ না থাকেন এবং তিনি 'আওয়ারিফুল মা'আরিফ' গ্রন্থটি পড়ে একে সতর্কতাসহ অনুসরণ করেন তাহলে তিনি উত্তম একজন সুফিতে পরিণত হবেন!"[1]

ইন্তিকাল

কোনো কোনো কিতাবে আছে শেষ জীবনে হযরত শাহাবুদ্দিন রাহমাতুল্লাহি আলাইহি অন্ধ হয়ে যান। মুহাররম মাসের ১ম তারিখ ৬৩২ হিজরি [১২৩৪ ঈসায়ী] তিনি এই ধরাধাম থেকে চিরবিদায় গ্রহণ করেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাজীউন। তাঁর জানাযায় ইমামতি করেন শায়খ অহ্দুদ্দীন বিন আবুল ফখর কিরমানী [মৃ. ৬৩৫ / ১২৩৮] রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। তিনি তাঁকে গোসল এবং কাফনও পরিয়ে দেন। বাগদাদের বিখ্যাত 'ওয়ার্দিয়া' কবরস্থানে এই মহান সুফি সাধক সমাহিত আছেন। তাঁর সমাধিস্থলের পাশেই একটি বড়ো মসজিদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

---

[১] তবে জানা থাকা আবশ্যক যে, এ যুগে মুর্শিদ ছাড়া সুফিতে পরিণত হওয়া আদৌ সম্ভব নয়। আহমদ কবির রাহিমাহুল্লাহ গ্রন্থের গুরুত্ব ও মাহাত্ম্য বুঝাতে যেয়ে এরূপ মন্তব্য করেছিলেন। তাঁর যুগেও কেউ মুর্শিদ ছাড়া বড় মাপের সুফিতে পরিণত হয়েছেন বলে কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ মিলে না। সুতরাং তাসাওউফের রাস্তায় চলতে হলে অবশ্যই একজন হক্কানী পীরের হাতে বাইআত গ্রহণ করতে হবে।

হযরত শাহাবুদ্দিন উমর সুহরাওয়ার্দি রাহমাতুল্লাহি আলাইহির তরীকতের সিলসিলা

রাহমাতুল্লিল আলামীন সায়্যিদিনা হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম
সায়্যিদিনা হযরত আলী ইবনে আবি তালিব রাদ্বিআল্লাহু আনহু
সায়্যিদিনা হযরত জাইনুল আবিদীন বিন হুসাইন রাদ্বিআল্লাহু আনহুমা
সায়্যিদিনা হযরত মুহাম্মদ বাকির রাহমাতুল্লাহি আলাইহি
সায়্যিদিনা হযরত জাফর সাদিক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি
সায়্যিদিনা হযরত মূসা আল-খাজিম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি
সায়্যিদিনা হযরত আলী রিজা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি
সায়্যিদিনা হযরত আবুল মাহফুজ আসাদুদ্দীন মারুফ খারক্বী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি
সায়্যিদিনা হযরত আবুল হাসান সারি বিন মুগালাস সাক্বাতি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি
সায়্যিদিনা হযরত আবুল ক্বাসিম জুনায়িদ বিন মুহাম্মদ খুররাজ বাগদাদী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি
সায়্যিদিনা হযরত আবু বকর জাফর বিন ইউনুস শিবলী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি
সায়্যিদিনা হযরত রহীমুদ্দীন আয়াজ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি
সায়্যিদিনা হযরত আবদুল আজিজ বিন হারিস বিন আসাদ ইয়ামনী তামিমী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি
সায়্যিদিনা হযরত আবুল ফারাহ মুহাম্মদ ইউসুফ বিন আবদুল্লাহ বিন ইউনুস তারতুসী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি
সায়্যিদিনা হযরত আবুল হাসান আলী বিন আহমদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি
সায়্যিদিনা হযরত আবু সাঈদ মুবারক বিন আলী মুখাররিমী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি
সায়্যিদিনা হযরত মুহিউদ্দীন শায়খ আবদুল কাদির মূসা জিলানী হাসানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি
সায়্যিদিনা হযরত শায়খ শাহাবুদ্দিন আবু হাফস উমর বিন মুহাম্মদ বকরী সুহরাওয়ার্দি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি।

প্রথম পরিচ্ছেদ

খানক্বায় অবস্থানকারীদের আদব

খানক্বায় দু’ধরনের লোকের সমাগম হয়:

১. সফরকারী (মুসাফির)।

২. বসবাসকারী (মুক্বিম)।

যখন কেউ কোনো সুফি খানক্বায় এসে অবস্থান করবেন তখন তিনি দুপুরের পূর্বেই উপস্থিত হতে চেষ্টা চালাবেন। যদি কোনো কারণে সময়মতো উপস্থিত হতে অপারগ হন তাহলে তিনি কোনো মসজিদ বা অন্যত্র রাত কাটাবেন। পরদিন সূর্যোদয়ের পর খানক্বায় প্রবেশ করবেন নিম্নলিখিত আদবগুলো রক্ষা করে:

১. প্রথমেই দু’রাকাত নফল নামায পড়বেন।

২. উপস্থিত সবাইকে সালাম জানাবেন।

৩. উপস্থিত সকলের সঙ্গে মুআনাকা ও মুসাহাফা করবেন।

সুন্নাত আদব হলো, আমগনকারী খানক্বায় অবস্থানকারীদের জন্য খাবার কিংবা অন্য কোনো উপহারসামগ্রী নিয়ে আসবেন। কথা বলতে অনুমান করবেন না; যতক্ষণ কেউ প্রশ্ন করবেন না, ততক্ষণ নীরব থাকবেন।

অন্তত ৩ দিনের জন্য বাইরে যাবেন না। ভ্রমণের ক্লান্তি থেকে মুক্ত হওয়ার পর তিনি শায়খের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন। এরপর বাইরে যেতে হলে খানক্বার দায়িত্বশীল ব্যক্তির নিকট থেকে যথারীতি অনুমতি গ্রহণ করে যাবেন। তিনদিন অবস্থানের পরই সিদ্ধান্ত নেবেন খানক্বায় অবস্থান করবেন কী না।

খানক্বায় বসবাসকারী ব্যক্তি আগত ভ্রমণকারীকে নিম্নে উল্লেখিত চারটি আদব রক্ষা করে স্বাগত জানাবেন:

১. সাদর সম্ভাষণ (তারহিব)।

২. সম্মান প্রদর্শন।

৩. আদর-যত্ন।

৪. হাসিমুখে থাকা।

খানক্বার খাদিম আনন্দচিত্তে মেহমানকে নাস্তা উপবেশন ও মিষ্টিমুখ করাবেন। যদি কোনো মেহমান খানক্বার আদব-কায়দা সম্পর্কে অনবগত হয়ে থাকেন তাহলে খানক্বায় অবস্থানকারী কেউ তার প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন থেকে বিরত থাকবেন ও তাকে প্রবেশে বাধা দেবেন না। কারণ অনেক পবিত্র ও পরহেজগার ব্যক্তিও সুফিদের আস্তানার আদব-কায়দা সম্পর্কে গাফিল। অবজ্ঞা হেতু তাদের হৃদয়ে আঘাত পেতে পারেন ও অন্তরে বিরক্তিবোধ এসে যেতে পারে। এর পরিণতি ঈমান ও জগতকে আহত করতে পারে।

মানুষের প্রতি দয়াপ্রদর্শন হলো উত্তম চরিত্রের লক্ষণ। অসুস্থ-চরিত্র হলো অসুস্থ স্বভাবের কুফল। খানক্বায় যদি কেউ আসেন, যিনি এখানে অবস্থানের যোগ্যতা রাখেন না অথচ উপস্থিত ব্যক্তিরা তার প্রতি দয়া প্রদর্শন ও উত্তম আচরণ দেখান, তাহলে তিনি অবশ্যই আকৃষ্ট হবেন।

খানক্বায় তিন দল লোকের সমাগম ঘটে:

ক. আহলে খিদমাত।

খ. আহলে সুহবত (সান্নিধ্যলাভকারী)।

গ. আহলে খিলওয়াত (অবসরকারী)।

আহলে খিদমাত হলেন ওসব নতুন সালিক যারা খানক্বায় এসেছেন, এ পথের প্রতি ভালোবাসা হেতু। তারা খাদিম হিসাবে কাজ করেন যাতে করে পরহেজগার ও মাক্বামাতের অধিকারী ব্যক্তিদের সুনজরে পড়েন। তারা অবশেষে এ রাস্তায় অগ্রসর হতেও পারেন। তারা ধীরে ধীরে সুফি সম্প্রদায়ের কার্যকলাপ সম্পর্কে অবগতি অর্জন করেন। এতে তারা অবশ্যই সুফিদের দ্বারা উপকৃত হতে পারেন। আর সর্বোপরি তারা খানক্বার খাদিম হওয়ার যোগ্যতা লাভে ধন্য হন।

বয়স্কদের জন্য সময় অতিবাহিত করার উত্তম পথ হলো আহলে খিলওয়াত হিসাবে অবস্থান। অপরদিকে যুবকদের জন্য সুহবতে বসা খিলওয়াত থেকে উত্তম। এতে তারা ইলম অর্জন করবে যাতে করে নিজেদের মধ্যে গোপনে অবস্থানরত শাহওয়াত সম্পর্কে তারা শতর্ক হয়ে যায়। এরূপ উপদেশবাণীই উচ্চারণ করেছেন হযরত আবু ইয়াকুব সুসী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি।

খানক্বায় অবস্থানকারীদের মধ্যে আছে ভাগ্য, অনুরক্তি ও খিদমাত; তারা দ্বীন ও দুনিয়ার গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদিতে একে অন্যকে সাহায্য-সহায়তা করেন। খিদমতের যোগ্য ঐ ব্যক্তি হতে পারেন যার বাহ্যিক সাদৃশ্য ও অভ্যন্তরীণ পবিত্রতা অর্জিত হয়েছে এবং মনের মধ্যে একান্ত আগ্রহ জন্মেছে সুফিয়ায়ে কিরামের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের। এটা স্থাপনের উদ্দেশ্য কারো না থাকলে খিদমাতের যোগ্য হিসেবে বিবেচিত হবে না। আকর্ষণ ও প্রেমাসক্তদের নিকট খিদমাতের অযোগ্যরা থাকায় অপরদের নিকট অনেক ভালো জিনিষও কদাকার বলে প্রতীয়মান হতে পারে।

খানক্বায় অর্পিত দায়িত্বশীল কেউ না থাকলেও উপস্থিত কামিল কোনো শায়খ মুরীদদের সবক প্রদান করবেন। শায়খ যদি মনে করেন মুরীদদের জন্য কিছু গ্রহণ পরিত্যাগ করে ফকিরী অবলম্বন দরকার, তখন তিনি তাদেরকে তাওয়াক্কুলের সবক দেবেন।

যদি এমন হয় হয় যে, খানক্বার মধ্যে কোনো শায়খ অনুপস্থিত থাকেন, তহালে নিম্নে বর্ণিত তিনটি পদ্ধতির যে কোনো একটি অনুসরণ করা প্রয়োজন।

১. তারা যদি ভ্রমণপথে দৃঢ় অবস্থানে থেকে থাকেন, তাদের তাওয়াক্কুলের স্তর হয় উচ্চে। তারা সবরকারী হলে, সাহায্য নিতে পারেন।

২. উপরোক্ত স্তরের অধিকারী না হলে তারা কস্ব [গ্রহণ] করার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন।

৩. তারা চাইলে ফকিরীর পথও বেছে নিতে পারেন।

খানক্বায় অবস্থানকারী সকলেই বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ দিক থেকে একে অন্যের সহায়ক হতে হবে। তারা সবাই একই স্থানে একই দস্তারখানে বসে খাবেন। তারা কখনো আলাদাভাবে পানাহার করবেন না। এরূপ বাহ্যিক সাহচর্য তাদের অন্তরলোকে ইতিবাচক ক্রিয়া করবে। ফলে একে অন্যের মধ্যে সত্যিকার ভালোবাসা ও পবিত্রতার মধ্যে সময় কাটবে। এ থেকে তারা মুক্ত থাকবেন ক্ষতিকর দুর্বলতা ও চিন্তাভাবনা থেকে। এরপরও যদি কোনো কারণে একজনের অন্তরে অপরজন সম্পর্কে অশুভ খিয়ালের জন্ম নেয় তাহলে তা সাথে সাথে দূর করতে হবে। যে কোনো মূল্যে মুনাফিকী পরিত্যাগ করা চাই। যে কোনো সমাজের ভিত্তি আন্তরিকতার পরিবর্তে যদি মুনাফিকীর ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহলে এ সমাজ থেকে কোনো সুফল বেরিয়ে আসবে না।

বাহ্যিক দিক থেকে একে অন্যের প্রতি সামঞ্জস্যবিধান পরিলক্ষিত হলেও, অন্তর যদি ঘৃণা দ্বারা বক্র হয়ে যায়, তাহলে সকল উত্তম কাজ বিফলে যাবে এবং তাদের ধ্বংস অনিবার্য হয়ে পড়বে। অনিচ্ছাকৃত যদি কোনো প্রতারণামূলক কার্য আত্মপ্রকাশ করে, তাহলে এতে অধ্যবসায় থেকে বিরত থাকতে হবে। সাথে সাথে ক্ষমাপ্রার্থনার মাধ্যমে ক্ষতিপূরণ করাও জরুরী। আর দুঃখপ্রাপ্ত ব্যক্তির জন্যও

উচিত হবে এই ক্ষমাপ্রার্থনাকে গ্রহণ করে নেওয়া। এভাবেই নেমে আসবে [আল্লাহর পক্ষ থেকে] প্রতিশ্রুত অনুগ্রহ।

সুতরাং বাহ্যিক ও গুপ্ত- উভয় দিক থেকে খানক্বায় অবস্থানকারীদের একে অন্যের মধ্যে থাকতে হবে সৌহার্দ্যতা, সমতা এবং নিষ্কলুষ শ্রদ্ধাবোধ। একমাত্র এরূপ গুণাবলীর অধিকারী হলেই দূরের বেহেশত তাদের নিকটবর্তী হতে পারে। অন্যরা যা শুধুমাত্র আকাঙ্ক্ষা করতে পারেন, তাদের জন্য তা হতে পারে বাস্তবতা।

একজন দরবেশ বা সুফির অন্তর কিভাবে হুব্বে দুনিয়া ও কুপ্রবৃত্তির স্থান হতে পারে? তারা তো দুনিয়াকে পরিত্যাগ করেছেন, একে পেছনে রেখে বিশেষ এক পন্থাবলম্বন করেছেন। ক্ষমাপ্রার্থনা শেষে ক্ষমাপ্রার্থী সবাইকে কিছু আপ্যায়ন করাবেন, ঠিক যেভাবে খানক্বায় ভ্রমণকারীরা করে থাকেন। দোষি ব্যক্তি তার দুষ্কর্মের খেসারত হিসাবে খানক্বার সদস্য হওয়ার মর্যাদা থেকে বঞ্চিত হবে। সে তো আলাদা বিচ্ছিন্নতার ভ্রমণে চলমান ও আড়ালে আছে। এই সুফিদের বৃত্তে ফিরে আসার যোগ্যতা হারিয়েছে। পুনরায় প্রবেশ করতে হলে অবশ্যই জরিমানা দিতে হবে- যাকে সুফিরা 'গ্বারামাত' বলেন।

কোনো ব্যক্তির মধ্যে যৌনাকাঙ্ক্ষা আত্মপ্রকাশ করলে, হৃদয়ের আলো দ্বারা এ অন্ধকার দূর করতে হবে। এ আকাঙ্ক্ষার শিকার ও শিকারী উভয়ই পাপী। যদি শিকার তার হৃদয় দ্বারা শিকারীর এই অন্ধকার আকাঙ্ক্ষাকে নিজের হৃদয়ের নূর দ্বারা মুবাকিলা করতো, তাহলে শিকারীর অন্তর থেকেও তা মুছে যেতো।

সত্যিকার সুফি তিনি, যিনি নিজের হৃদয়কে পবিত্র করতে সদা-সচেষ্ট এবং এর ভেতর কোনো আবর্জনা ঢুকতে কিছুতেই সুযোগ দেন না। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে এই স্তরে উন্নীত হতে সাহায্য করুন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

শারীরিক ভ্রমণের আদব-কায়দা

এটা নিঃসন্দেহে বলা যায়, দুরারোগ্য লোভ-লাসসা ও যৌনাকাঙ্ক্ষাকে যারা আয়ত্বে আনতে সক্ষম হয়েছেন তাদের জন্য শারীরিক সফর বিরাট লাভজনক হবে। নিজের বাসস্থান, পরিবার-পরিবর্গ, বন্ধু-বান্ধব ও পছন্দনীয় অনেক কিছু থেকে আলাদা হওয়া এবং বিপদে ধৈর্যাবলম্বন মানুষের মধ্যস্থ লোভ-লালসা ও স্বাভাবিক প্রবণতা হ্রাস পায়। এসব ব্যাপার নিয়ন্ত্রণে থাকলে ভ্রমণের প্রভাব নফল রোযা ও নামাযের প্রভাব থেকে কম হবে না।

চামড়া পাকা করার কারখানা বা ট্যানারিতে মৃত চামড়ার ওপর কার্য সমাধা করলে এর মধ্যে আত্মপ্রকাশ করে পবিত্রতা, কোমলতা এবং বোনটের কমনীয়তা। অনুরূপ সফর হচ্ছে ট্যানারিতে কার্য সমাধার মতো- এরই মাধ্যমে সফরকারী স্বাভাবিক দুষ্কর্ম ও অন্তর্জাত অমসৃণতা থেকে মুক্ত হয়। ফলে এতে আত্মপ্রকাশ করে পবিত্র আনুগত্যতার কোমলাতা এবং একগুঁয়েমি পরিবর্তিত হয়ে রূপান্তরিত হয় ঈমানে।

সুতরাং, শরীয়তের প্রবর্তক [হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] সফর করতে প্ররোচিত করেছেন। যদিও সালিকের কাঙ্ক্ষিত তরীকতের মাক্বাম তথা হাক্বিক্বাত অর্জন শারীরিক সফরের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। অনেক শায়খ ছিলেন বা আছেন যাঁরা শুরুতে কিংবা শেষে কখনও সফর করেন নি। তাঁদের ওপরও আল্লাহর অনুগ্রহের দৃষ্টি পড়েছে। আকর্ষণের বন্ধন তাঁদেরকে সর্বনিম্ন স্তর থেকে সর্বোচ্চ স্তরে উপনীত করেছে। তাঁরা মুর্শিদে কামিল হওয়ার গৌরব লাভ করেছেন।

তবে অনেক শায়খই সফর করেছেন। কেউ হয়তো শুরুতে ভ্রমণ করেছেন লাভের আশায়; কেউ হয়তো শেষের দিকে সফর করেছেন লাভ বন্টনের

উদ্দেশ্যে। কেউ কেউ আবার জীবনের শুরু ও শেষ এ উভয় সময়েই সফর করেছেন। এতে স্থিত করেছেন তাঁদের নিজস্ব দেখভাল ও হালকে (অবস্থাকে)।

হযরত ইব্রাহিম ইবনে খাওয়াস রাহমাতুল্লাহি আলাইহি কোনো শহরেই ৪০ দিনের বেশি অবস্থান করতেন না। এরই মধ্যে তিনি নিজের হাল ও তাওয়াক্কুলকে নিয়ন্ত্রণের প্রশিক্ষণ নিতেন। হযরত ঈসা আলাইহিস্সালাম সফরের অবস্থায় জীবন কাটিয়েছেন। ঈমানের নিরাপত্তা হেতু তিনি কখনও এক স্থানে স্থায়ীভাবে বসবাস করেন নি।

শারীরিক সফরকারীকে ১২টি আদব রক্ষা করতে হবে:

১. সংকল্পে অটল থাকা; এবং সম্মানীত উদ্দেশ্যকে প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

এ লক্ষ্যর্জনে ৬টি উপায় অবলম্ব করা চাই:

ক. সঠিক ইলম অর্জন।

খ. শায়খ ও সুফি ভাইদের সঙ্গে সাক্ষাৎ। সালিহীন ব্যক্তিদের সুনজর ও সুহবত তরীকতের সালিকের জন্য খুব বেশি উপকারী হয়ে থাকে।

সফরকারী হয়তো এই সুনজরপ্রাপ্তির যোগ্য হতে পারেন। সুতরাং এরই মাধ্যমে তিনি দুনিয়া-আখিরাতে লাভবান হওয়ার সুযোগ পাবেন।

সুনজর সম্পর্কে জানা থাকা দরকার, কিছু সর্পের নজরের মধ্যে আল্লাহ তা'আলা বিশেষ শক্তি প্রদান করেছেন। এই নজর কারোর ওপর পড়লে সে ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। অরপদিকে প্রভুর স্নেহভাজনদের নজরে আল্লাহ এমন গুণাগুণ দান করেছেন যে, সালিকের ওপর তাঁদের নজর পড়লে যোগ্যতানুসারে সে উত্তম জীবন ও আনন্দলাভে ধন্য হবে।

মিনার মসজিদে খায়ফে হযরত শায়খ জিয়াউদ্দীন আবু নাজিব ঘুরাফেরা করছিলেন। তিনি সবার দিকে তীক্ষ্মদৃষ্টিতে তাকাচ্ছিলেনও। লোকজন তাঁকে এর কারণ জিজ্ঞেস করলে জবাব দিলেন: "আল্লাহর ওলিদের সন্ধানে আছি। তাঁদের সুনজর আনন্দ প্রদান করে। আমি সেই সুনজর খুঁজছি।"

গ. সচরাচর স্বাভাবিক বিষয়-বস্তু থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া। প্রিয় ভাইবোন, বন্ধু-বান্ধব ও আপনজনদের থেকে আলাদা হওয়ার তিক্ততা গলদ্ধকরণ। কারণ স্বজনদের থেকে আলাদা থাকার ধৈর্যধারণ নিয়ে আসে অনেক মূল্যবান উপকার।

ঘ. আত্মার গোপন অনেক মূল্যবান বিষয় সফর হেতু প্রকাশ হবে। তবে মুসাফিরকে পরিত্যাগ করতে হবে এর অলঙ্করণ ও দাবি-দাওয়া। কারণ অনেক তিরস্কারযোগ্য সচরাচর কর্ম সফরের সময় দূরে থাকার কারণে আত্মপ্রকাশ করে। খানক্বায় কিংবা নিজের বাড়িতে থাকাকালে ভ্রমণকারী [আকাঙ্ক্ষা পূরণের সুযোগ থাকার কারণে] নিজের নফসের মধ্যে বিঘ্ন বা উত্তেজনা অনুভব করে না। কিন্তু সফরের অবস্থায় সে অভাবকে অনুভব করে ও রাজীখুশি এবং ধৈর্যসহ এর মুকাবিলা করতে বাধ্য হয়।

সফরের অবস্থায় বিপদাপদ দীর্ঘমেয়াদী হতে পারে। হৃদয়ে আত্মপ্রকাশ করতে পারে ঘৃণা ও ক্রোধের। অথচ ইতোমধ্যে এরূপ অবস্থা সে কখনো নিজের মাঝে আছে বলে জানতো না।

ঙ. একাকিত্ব বরণ করা ও [মানুষের নিকট] গ্রহণীয় না হওয়া। কোনো বিশেষ স্থানে অবস্থানকারী 'হালের' শায়খদের 'হাল' সেখানে অবস্থানরত অন্যান্য সালিক ও উন্নত আত্মাসমূহে ব্যাপ্ত হয়। তিনি হয়ে ওঠেন উন্নত মাক্বামে পৌঁছুনোর উপায় বা ক্বিবলা। মানুষ তাঁকে নিজেদের শায়খ হিসাবে গ্রহণ করে। এই অবস্থাটি

তরীকতের ভ্রমণকারীর জন্য পরীক্ষার সূত্র। কিন্তু যারা এ স্তরে উপনীত হয়েছেন, তাঁদের জন্য এটা নির্বাচিতজন হওয়ার ইঙ্গিত।

মুসাফিরদের [যারা উক্ত পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছেন] ভ্রমণকালীন একাকিত্ববরণ এবং মানুষের স্নেহভাজন হওয়া থেকে বঞ্চিত থাকা হলো পূর্বশর্ত। কারণ মুসাফির যদি মানুষ কর্তৃক গ্রহণীয় হয়ে যায় তাহলে এটা তার জন্য পদস্খলন বৈ নয়। এখানেই তাদের পা পিছলে যায়। এখানেই তারা তাদের মুখ প্রভু থেকে ফিরিয়ে নেয় মানুষের দিকে। একমাত্র সেই ব্যক্তি এই পদস্খলন থেকে নিরাপদ যিনি মহান চিরন্তন প্রভুর করুণার পাত্র হয়েছেন। আর যে এরূপ [মানুষ কর্তৃক সমাদরের] স্থানকে উপেক্ষা করে অন্যত্র চলে যায়, সে বিপর্যয় থেকে রক্ষা পেলো এবং সঠিক রাস্তার উপর অটল রইলো।

চ. আল্লাহর এককত্বের আয়াতসমূহ সর্বদা পাঠ করা। জগৎ ও আত্মাসমূহ সম্পর্কে চিন্তা করা। জগতে আল্লাহর কুদরত ও হিকমাতের বিকাশ, সৃষ্ট বস্তুসমূহ ও এদের পরিণতি ইত্যাদি সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করা। এরূপ চিন্তা-চেতনা হেতু ভাবনার শক্তি বৃদ্ধি পাবে। খুঁজে পাওয়া যেতে পারে আল্লাহর কুদরত ও হিকমাতের প্রমাণসমূহ।

২. সফরে একজন বন্ধুকে সাথে নেওয়া: সফর অবস্থায় কিছু না কিছু বিপদাপদ ও বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতে হয়। সুতরাং সাহায্যকারী হিসাবে একজন বন্ধু থাকা জরুরী। ক্লেশ ও পীড়াকে সহ্য করতে যারা খুব শক্তিশালী তাদের কেউ কেউ একাকী সফরে যেয়ে থাকেন। তবে প্রত্যেকে এভাবে একাকী সফর করা মোটেই সহজ নয়।

৩. সফরকারীদের আমীর: একজনকে আমির বানাতে হবে যার নির্দেশনাবলী সবাই মেনে চলবেন, ঠিক যেভাবে হাদীসে এসেছে। ঐ ব্যক্তির ক্ষমতা বিরাট যিনি কৃচ্ছ্রসাধনা, পরহেজগারী, উদারতা ও করুণার ক্ষেত্রে ক্ষমতাবান।

বর্ণিত আছে, হযরত আবু আবদুল্লাহ মারুজি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি সফরে যেতে ইচ্ছে করলেন। হযরত আবু আলী রাবাতি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর সফরসঙ্গী হওয়ার ইচ্ছাপোষণ করলেন। আবু আবদুল্লাহ বললেন:
এক শর্তে যেতে পারো- হয় তুমি না হয় আমি আমির হবো।
আবু আলী প্রস্তাব দিলেন: আপনিই হবেন আমির।

উভয়ে একসঙ্গে সফরে বের হলেন। আবু আবদুল্লাহ নিজের মাথায় রসদপত্র বহন করে চলতে থাকেন। এ রাতে মরুভূমিতে বৃষ্টি হলো। বৃষ্টি থেকে বাঁচানোর জন্য আবু আবদুল্লাহ নিজের রসদপত্রের ঝুড়িকে ছাতা বানিয়ে সারারাত আবু আলীর মাথার উপর ধরে রাখলেন। আবু আলী বললেন:
এ আপনি কী করছেন?
আবু আবদুল্লাহ জবাব দিলেন: আমি হচ্ছি আমির। আমি যা করি তা তোমাকে মেনে নিতে হবে।

ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত কোনো ব্যক্তির দৃষ্টি যদি তার অনুসরণকারীদের ওপর পড়ে এবং ইচ্ছে হয় শাসনের কিংবা যৌনাকাঙ্ক্ষা মোটানোর, তাহলে সে অবশ্যই সুফিদের অন্তর্ভুক্ত নয়।

৪. ভাইদের থেকে বিদায় গ্রহণ: হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেভাবে নির্দেশ দিয়েছেন, সেভাবে [খানক্বার] ভাইদের নিকট থেকে বিদায় গ্রহণ করতে হবে। ভাইদেরও উচিৎ সফরকারীদের জন্য দু’আ করা। রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও ভ্রমণকারীদের জন্য দু’আ করেছেন।

৫. নিজের অবস্থান থেকে বিদায় গ্রহণ: সফরকারী সরঞ্জামাদি প্রস্তুত করার পর দু’রাকাআত নামায আদায় করবেন। হযরত আনাস বিন মালিক রাদ্বিআল্লাহু আনহু বর্ণিত হাদিস শরীফে আছে, রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

দু’রাকাআত নামায না পড়ে কোনো ভ্রমণে যাত্রা করেন নি। নামায শেষে তিনি দুআ করতেন, ‘হে আল্লাহ! আমার ধার্মিকতা বৃদ্ধি করে দিন, আমার গুনাহ মাফ করুন, আমাকে উত্তম বস্তুর দিকে ফেরান যা আপনি পছন্দ করেন।’

৬. যখনই ভ্রমণকারী তার বাহনে আরোহণ করবে, তখন তাকে এই দু’আ করা উচিৎ: ‘‘মহান আল্লাহর নামে। আল্লাহ তা’আলার প্রশংসা জ্ঞাপন করছি যিনি একে আমাদের জন্য বাহন বানিয়েছেন। আল্লাহ সবার বড়ো। আমি তাঁর উপর ভসরা করি। আল্লাহ ছাড়া আর কারো কোনো ক্ষমতা কিংবা নির্দেশ কার্যকর নয়। আপনিই সবকিছুর ওপর আরোহণ করানেওয়ালা এবং সবকিছুর সাহায্যকারী।’’

৭. বাড়ি বা খানক্বাহ থেকে বৃহস্পতিবার ভোরে যাত্রা করা: হযরত কা’ব ইবনে মালিক রাদ্বিআল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বৃহস্পতিবারই সফরে বের হতে ও সৈন্যদেরকে অভিযানে প্রেরণ করতে পছন্দ করতেন।

৮. বাড়ি বা খানক্বাহর নিকটস্থ হয়ে এই দু’আ করা উত্তম: ‘‘হে ক্রবর্ধমান আসমানসূহের প্রভু, হে সংকোচ হওয়া জমিনের প্রভু! হে বিভ্রান্তকারী শয়তানের প্রভু! হে বেগবান বাতাসের প্রভু! হে প্রবহমান পানির প্রভু! হে আল্লাহ! আমি বাড়ি [খানক্বাহ] ও এতে অবস্থানরত লোকজনের জন্য আপনার দরবারে উত্তম বস্তুর জন্য প্রার্থনা করছি। আমি সবাইকে আপনার হিফাজতে রেখে যাচ্ছি।’’

৯. বাড়ি বা খানক্বার প্রতি অভিবাদন: বাড়ি বা খানক্বার প্রতি অভিবাদন হিসাবে সওয়ারীতে আরোহণের পূর্বে দু’রাকাআত নামায আদায় করা উচিৎ।

১০. সফরের যাবতীয় সামগ্রী গোছগাছ করা: ভ্রমণকারী নিজের সঙ্গে রাখবে পানির ব্যাগ (বোতল) ও কোমরবন্ধ। এগুলো রাখা সুন্নাত। হযরত আবু সাঈদ

খাররাজ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনা শরীফ থেকে মক্কা মুকাররমায় ভ্রমণকালে উক্ত দু'টি বস্তু প্রত্যেকের সঙ্গে নিতে নির্দেশ দিয়েছিলেন।

১১. যাত্রাবিরতির স্থান ও জিন্দা-মুর্দাদের প্রতি অভিবাদন: যাত্রাবিরতির জন্য নির্বাচিত কোনো জনপদ দৃষ্টিগোচর হলেই সফরকারী ঐ স্থান ও এর জিন্দা-মুর্দা সকল মানুষের জন্য দু'রাকাআত নামায পড়ে দু'আ করবেন। কুরআন থেকে কিছু তিলাওয়াত করে সকলের উপর সওয়াব রেসানি করে এই দু'আ পাঠ করবেন: "হে আল্লাহ! এই স্থনের মধ্যে আমাদেরকে দান করুন উত্তম বিশ্রাম ও রিজিক।"

১২. গোসল করা: শহর বা জনপদে প্রবেশের পূর্বে সম্ভব হলে গোসল করা উত্তম। কারণ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা শরীফে প্রবেশের পূর্বে গোসল করেছেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

প্রসঙ্গ: সামা' সম্পর্কে আদব-কায়দা

সুফিদের একটি প্রশংসনীয় রহস্য হচ্ছে সামা' যার ওপর বাহ্যিক উলামায়ে কিরাম ভিন্নমত পোষণ করে থাকেন। সাধারণ সামা' অর্থ:

১. গ্বিনা [গান] এবং ইলহান [সুর] শ্রবণ।

২. গায়ক বা কাওয়ালদের অনুষ্ঠানে নিয়ে আসা।

সামা' অবৈধ হওয়ার কারণ হিসাবে বলা হয়, এটা একটি বিদআত। কারণ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সাহাবায়ে কিরাম, তাবিঈন, উলামা ও পুরাতন যুগের মাশাইখদের সময় সামা'র প্রচলন ছিলো না। পরের যুগের কিছু শায়খ এর প্রবর্তন করেন। কিন্তু তাঁরা মনে করেন এটা সুন্নাত বিরোধী কোনো কাজ নয়, সুতরাং এটা একটি প্রশংসনীয় কাজ। সামা'র মাধ্যমে তিনটি ফায়দা হতে পারে:

ক. কৃচ্ছ্রতাবলম্বী সাথী ও জাহিদদের আত্মা ও হৃদয়ে ক্লান্তিবোধ, দুঃখ, সংকোচন [কব্জ] এবং নৈরাশ্যের সৃষ্টি হয় বিভিন্ন কারণে। এসব বিপর্যয়মূলক আত্মিক অবস্থার মুকাবিলার জন্য আধুনিক শায়খরা সামা'কে একটি আধ্যাত্মিক রচনায় রূপান্তর করেছেন। এতে থাকে মিষ্টি কথা, শ্রুতিমধুর সুর, চিত্তে-আনন্দদানকারী কবিতা। প্রয়োজনের সময় একে আগ্রহশীল করা হয়ে থাকে।

খ. নফসের ক্ষমতা প্রকাশ পাওয়ার মাধ্যমে, পবিত্র সালিকের মধ্যে [আল্লাহর মাহাত্ম্যের] পর্দা পড়ে। সুতরাং 'হাল' এর অবস্থার বৃদ্ধি বন্ধ হয় ও [প্রভু থেকে] বিচ্ছিন্নতা হেতু আকাঙ্ক্ষার প্রাবল্যতা কমে যায়। এরপর সালিক যখন [তার হাল বর্ণনাসম্বলিত] ললিত গীত ও গজল শ্রবণ করে তখন তার মধ্যে আরেক অদ্ভুত

হালের সৃষ্টি হয়। তখন উক্ত পর্দা তার সম্মুখ থেকে সরে যায় এবং উন্নত স্তরে উপনীত হওয়ার দরজা উন্মুক্ত হয়।

গ. এই রাস্তার পথিকের বিভিন্ন স্তরে পরিবর্তন হয়। যেমন: ১. [মন্থর] ভ্রমণ থেকে [ক্ষিপ্র] উড়োগতি। ২. [শ্রমসাধ্য] ভ্রমণ থেকে [অপ্রতিরোধ্য] আকর্ষণ। ৩. [প্রভুর] প্রেমিক থেকে [প্রভুর] প্রেমাস্পদ। এসব স্তরের ইতি নেই। তবে সামা’ শ্রবণের সময় আত্মার কর্ণ খুলে যেতে পারে। মগ্নতার মাঝে প্রাপ্ত হতে পারে শুরুহীন চিরন্তনের ঠিকানা ও ‘প্রথম অঙ্গীকার’ [আলাসতু বিরাব্বিকুম] সম্পর্কে বাস্তব জ্ঞান। হতে পারে, আত্মার পক্ষিকে ঝেড়ে ফেলে এর মধ্য থেকে মুছে ফেলবে অস্তিত্বের ধুলোবালি ও এর বিপর্যয় এবং অপবিত্রতা। হয়তো বা চিরমুক্ত হবে হৃদয়ের কলুষতা, যৌনাকাঙ্ক্ষা ও অস্তিত্বের জঙ্গল থেকে।

এরপর দ্রুত গতিতে আত্মা প্রভুর নৈকট্যে পৌঁছুয়ে যেতে পারে। পবিত্র সালিকের মন্থর ভ্রমণগতি পরিবর্তন হয়ে উড়ালগতিতে রূপান্তর হতে পারে। তার শ্রমসাধ্য পথচলা হয়ে যেতে পারে অপ্রতিরোধ্য অতিআকর্ষণ। সে হতে পারে আশিক থেকে মাশুক। মোটকথা, সামা’র মাধ্যমে সে যে পরিমাণ রাস্তা পাড়ি দেবে, এটা ছাড়া সে হয়তো এক বছরে ততটুকু অগ্রসর হতে সক্ষম হবে না।

কারোর জন্য সর্বোত্তম কাজ হলো [নফল] ইবাদত। অন্যের জন্য ফায়দা দৃষ্টিগোচর না-ও হতে পারে। কিন্তু নফল ইবাদত ছেড়ে দেওয়া উচিৎ নয় আর জরুরী তথা ফরয-ওয়াজিব তো পরিত্যাগ করা হারাম।

সামা’ কোনো সলিকের জন্য বিপর্যয়ের কারণও হতে পারে। অনেকে হয়তো সামা’র অনুষ্ঠানে যোগ দেবে যৌনাকাঙ্ক্ষার চরিতার্থে কিংবা নফসের বিনোদনকল্পে। এদের মধ্যে না আছে কোনো আন্তরিকতা, না আছে নিজের আধ্যাত্মিক হালের উন্নতিকল্পনা।

উক্ত আন্তরিকতাহীন ব্যক্তিরা সামা'র অনুষ্ঠানে জড়োত হয় নিম্নেলিখিত ফায়দাগুলো হসিল করতে পারে:[২]

১. এই অনুষ্ঠানে খাবার পাওয়া যাবে।

২. নর্তন-কুর্তন করা যাবে, আনন্দ-ফুর্তিতে সময় কাটবে।

৩. অবৈধ ও ঘৃণ্য বস্তুসামগ্রী প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা।

৪. জাগতিক বস্তুর প্রতি আকর্ষণ।

৫. ওয়াজদ ও হাল লাভের লোভ।

৬. তাড়াতাড়ি শায়খে পরিণত হওয়ার ইচ্ছা।

৭. ব্যক্তিগত সম্পদের বড়াই করা।

উক্ত সবগুলো বস্তু হচ্ছে বিপর্যয়ের সারাংশ। এগুলো ঈমানদারের জন্য ঘৃণ্য কর্ম। যে কোনো সামা' অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য যদি উক্ত আকাঙ্ক্ষাগুলোর একটিও পরিপূর্ণ হওয়া থেকে থাকে, তাহলে সালিকের সত্যিকার মাক্বামগুলো হাসিল করতে চরম বাধার সম্মুখীন হতে হবে। যেমন: হাল, অভ্যন্তরীণ পবিত্রতা অর্জন, হৃদয়ের প্রশান্তি।

উক্ত অভিযোগগুলো হযরত জুনাইদ বাগদাদী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির যুগে উত্তাপিত হয়েছিল। ঐ সময়টি ছিলো শায়খ ও সুফিদের যুগ। জীবনের শেষের দিকে হযরত জুনাইদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি সামা' পরিত্যাগ করেন। এ সম্পর্কে তাঁকে প্রশ্ন করা হলে জবাব দেন: আমি কার সাথে সামা'য় যোগ দেবো? লোকজন জবাব দিলো: আপনার আত্মা, শুনুন। তিনি বললেন: কার কাছ থেকে শুনবো?

---

[২] বার্ণিত হারাম কাজগুলো থেকে রক্ষা পেতেই আধুনিক যুগের মাশাইখে আজম সামা' সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করেছেন। আমরাও মনে করি সামা' এ যুগের মানুষের ঈমান-আমলের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে। শিহাবুদ্দিন সুহরাওয়ার্দি এবং তাঁর পূর্বে ইমাম কুশাইরীও সামা'কে অবৈধ বলেন নি। এখানে তাঁর গ্রন্থের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে সামা' সম্পর্কে বর্ণিত অধ্যায়টি যুক্ত করা হয়েছে। এর অনুসরণে সামা' প্রবর্তন উদ্দেশ্য নয়। যেভাবে বর্ণিত সেভাবে সামা' অনুষ্ঠান করা ও এ থেকে আধ্যাত্মিক ফায়দা হসিল আজকাল আদৌ সম্ভব হবে বলে আমরা মনে করি না।

অনুশোচনাকারী বন্ধুদের সঙ্গে সামা'য় যোগ দেওয়া বৈধ। যে আল্লাহর প্রেমে বিদগ্ধ ও আখিরাতের আকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি, তাদের মুখ থেকে শ্রবণ [সামা'র গজল] কারও বৈধ।

এটা নিঃসন্দেহে সত্য যে, সুরেলা কণ্ঠ আল্লাহর অনুগ্রসমূহের মধ্যে একটি। সুরতাং উট চালকের গীত হেতু অল্প সময়ে দীর্ঘ পথ পাড়ি দেয় মরুভূমির উটগুলো।

হযরত জুনাইদ বাগদাদী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে প্রশ্ন করা হলো, 'মানুষ কুরআনের আয়াত শ্রবণ করেও শান্ত থাকে, কিন্তু কাওয়ালের মিষ্টি সুর শ্রবণ করলে কেনো অস্থিরতা ও অন্তরে আলোড়ন বোধ করে?' তিনি জবাব দিলেন, 'আমাদের আত্মাসমূহ সৃষ্টির পর সবাইকে একত্র করে আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আলাসতু বিরাব্বিকুম?' -আমি কি তোমাদের প্রভু নই? আমরা জবাব দিলাম, 'বালা- শাহিদনা' -অবশ্যই, আমরা সাক্ষ্য প্রদান করছি। এ কথোপকথনের মিষ্টি সুর আমাদের আত্মার কর্ণে এখনও সংরক্ষিত আছে। এর ফলেই আমরা কুরআন তিলাওয়াত শ্রবণেও শান্ত থাকি। কিন্তু নতুন কোনো মিষ্টি সুর শুনলে অন্তরে আন্দোলন সৃষ্টি হয়।'

একইভাবে ব্যাখ্যা দিয়েছেন, হযরত যুননুন মিসরী ও হযরত সামনুন মুহিব রাহমাতুল্লাহি আলাইহিমা।

'বুকা' [বিলাপ] দু'ধরনের:

ক. সাধারণ আনন্দের বিলাপ।

খ. পরমানন্দের [ওয়াজদ] এর বিলাপ।

বুকা সৃষ্টি হয় ভয়, আকাঙ্ক্ষা, আনন্দ কিংবা ওয়াজদ থেকে। জয় বা আনন্দের মাত্রা বেশি হলে মানুষ কাঁদতে থাকে। এটাই হচ্ছে সাধারণ আনন্দ বা জয়ের

বিলাপ। মনে করুন কারো আদুরে ছেলে কিংবা প্রিয় পাত্র দীর্ঘদিন সমুদ্রভ্রমণ থেকে ফিরে আসলো। বাবা জড়িয়ে ধরে চোখের পানি ফেললেন- এটা হলো জয় বা আনন্দের ক্রন্দন।

পরমানন্দের বা ওয়াজদের বুকা তখনই প্রকাশ পায় যখন হাক্কুল ইয়াক্বীন [বাস্তবতার মহাসত্য] এর ঔজ্জ্বল্যতা অন্তরে চমকাতে থাকে এবং একই সময় অনন্তের [কিদাম] বায়ু প্রবাহিত হয় বিপর্যয়ের [হুদুস] ওপর। ওয়াজদের বাকি অস্তিত্ব এই কিদাম ও হুদুদের মাঝে ওঠানামা করতে থাকে। এই অবস্থার প্রকাশ পায় এক ফোটা অশ্রুর মাধ্যমে।

মানবতার ঊর্ধ্বে যাকিছু কর্তৃত্ব বিদ্যমান তাকে সামা’ শক্তিশালী করে তুলে। যাদের অন্তর আল্লাহর প্রেমে নিমগ্ন তাদের জন্য সামা’ উৎকর্ষের কারণ। আর যাদের অন্তর লোভ-লালসা ও যৌনাকর্ষণের মধ্যে ডুবন্ত তাদের জন্য সামা’ বিপর্যয়ের কারণ। প্রথমোক্ত ব্যক্তিদের জন্য ‘ওয়াজদ’ হালের উৎকর্ষ হলেও দ্বিতীয়োক্ত ব্যক্তিদের জন্য তা বিচ্যুতি। কারণ ওয়াজদ হচ্ছে [হারানোর পর] পুনরায় মুশাহাদার [দর্শনের] অবস্থায় ফিরে যাওয়া। সামা’য় ওয়াজদ হচ্ছে পরাজিত, এবং মুশাহাদার অবস্থা হারানোর কারণ হচ্ছে ‘উজুদ’ [অস্তিত্ব] এর গুণাগুণের আত্মপ্রকাশ।

উজুদ এর গুণাগুণ হচ্ছে:

ক. লালসা থেকে সৃষ্ট অন্ধকারাচ্ছন্ন, নিষ্ফলতার পর্দা।

খ. অন্তর থেকে উত্থিত ঔজ্জ্বল্যতা, নিশ্চিততার পর্দা।

সামা’য় ওয়াজদের সূত্র হচ্ছে:

ক. নিষ্কলুষ মিষ্টি সুর কিংবা নিশ্চিততার হৃদয় ও আত্মায় পরমান্দবোধ।

খ. নিষ্কলুষ সুর [যা থেকে শুধুমাত্র আত্মা আনন্দবোধ করে]

যেখানে শ্রবণকারীর হৃদয় সামা'কে নিশ্চিততার মধ্যে সম্পর্কিত করে ও নফসকে সম্পর্কিত করে নিষ্ফলতার মধ্যে।

অস্তিত্বের পর্দা থেকে মুক্ত হতে মুশাহাদার হাল অবিরত থাকা চাই। অপরদিকে [আল্লাহর গুণগানের] সামা' দ্বিতীয়োক্তদের জন্য বিরতিহীন হওয়া চাই। সুরের সামা' নড়াচড়া সৃষ্টি করে না- কারণ, হামলার মাধ্যমে নড়াচড়া সৃষ্টি হওয়া একটি অদ্ভুত অবস্থা বটে।

মুশাহাদার হাল এবং [আল্লাহকে] উদ্দেশ্য করার সামা' অবিরত মুশাহাদার মধ্যে পতিত ব্যক্তির কাছে কোনো অদ্ভুত অবস্থা হিসাবে প্রতীয়মান হয় না। সুতরাং এরূপ ব্যক্তি কখনো সামা'র কারণে নড়াচড়ার অবস্থায় পতিত হন না।

সাহল ইবনে আবদুল্লাহ তুসতারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির একজন সহচর বলেন: 'আমি সাহলের সান্নিধ্যে বহুদিন অবস্থান করি। আমি কখনো দেখি নি, জিকির, কুরআন তিলওয়াত বা অন্য কোনো আমল হেতু তাঁর মধ্যে কোনো পরিবর্তন এসেছে। কিন্তু তাঁর শেষ জীবনে কেউ একজন কুরআন শরীফের এই আয়াতটি পাঠ করলেন:
"তোমার কুরবানী আজ তিনি গ্রহণ করবেন না।"

হঠাৎ করে তাঁর মধ্যে হালের অবস্থা সৃষ্টি হলো। তিনি কাঁপতে কাঁপতে পড়ে গেলেন। আমি এর কারণ জিজ্ঞেস করলাম। জবাব দিলেন, "আমার মধ্যে দুর্বলতা এসেছে।" পরে ইবনে সালিম তাঁর অবস্থা সম্পর্কে জানতে চাইলেন। জবাব দিলেন: "এটা দুর্বলতা থেকে হয়েছে।" জিজ্ঞেস করা হলো, এটা যদি দুর্বলতা থেকে হয়ে থাকে তাহলে ক্ষমতা কি? বললেন: "ক্ষমতা হচ্ছে সেটি যা একমাত্র হালের অবস্থা ছাড়া কোনো ব্যক্তির মধ্যে আসে না। সে এটা থেকে কষ্ট পায় কিন্তু এর দ্বারা পরিবর্তিত হয় না।"

একদা মুমশাদ দিনাওয়ারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি একটি জনপদ অতিক্রম করছিলেন যেখানে প্রথমসারির লোকজন একত্রিত হয়ে সামা'য় নিমগ্ন ছিলেন। তাঁকে দেখে কিন্তু তারা সরে যেতে চাইলো। হযরত বললেন, "তোমরা তোমাদের ইচ্ছেমাফিক অনুষ্ঠান চালিয়ে যাও। সকল বাদ্যযন্ত্র একত্রিত করে আমার কানের নিকট বাজালেও আমাকে একবিন্দু বিচ্যুত করতে পারবে না। না পারবে একটুকুও উপশম করতে আমার বেদনা।"

যে কেউ অবিরত মুশাহাদার স্তরে উপনীত আছেন, সামা' দ্বারা তার মধ্যে কোনো পরিবর্তন আসে না। পূর্বে যা ছিলো তা-ই থাকবে। যে হৃদয় সর্বদা আল্লাহর সম্মুখে উপস্থিত এবং সামা'কে অগ্রাহ্য করেছে সে হৃদয়ে যাকিছু শব্দ পৌঁছুয় না কেনো, সবই প্রভু থেকে এসেছে বলে প্রতীয়মান হয়। তখন তাঁর সামা' মানুষের সুরের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না। হযরত আবু উসমান মাগরিবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, নিজের অভ্যন্তরের ধ্বনি তার জন্য সামা'। বাইরের কোনো কর্ণের প্রয়োজন নেই। হযরত হুসরি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, যার সামা' অবিরত চলমান, গুপ্তের সাথে হৃদয়ে, এবং সর্বদা লালসার বর্ণনামুক্ত, সেটা ধ্বনিত হয় তার হৃদয়ে। সে কখনো শ্রবণ করে আল্লাহর কালাম, কখনো অস্তিত্বের অণু-কণার প্রশংসাবাণী, কখনো ভেতরের দিকে আর কখনো বাইরের দিকে।

হযরত আবু বকর শিবলী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি একদিন বাগদাদের একটি বাজারে ঘুরাফেরা করছিলেন। এক শশা বিক্রেতা চিৎকার দিচ্ছিল, 'এক ডাং [মুদ্রা] এর বদলে একটি খিয়ার [শশা]!'
হযরত শিবলী পাল্টা চিৎকার দিলেন, 'মাত্র এক ডাংয়ে খাইয়্যার [ভালো লোক] মিললে, পাপীর দাম কি হবে?'

আমিরুল মু'মিনীন হযরত আলী ইবনে আবি তালিব রাদ্বিআল্লাহু আনহু একদিন শাঁখের ধ্বনি শুনলেন। সাথীদের বললেন, 'এই শাঁখ যা বলে তোমারা কী জানো?'

তাঁরা জাবা দিলেন, 'না।' তিনি বললেন, 'এটা বলছে, সুবহানাল্লাহ! ইয়া আল্লাহ! ইয়া আল্লাহ! নিশ্চিয়ই তিনি চিরঞ্জীবী!'

হযরত আবদুর রহীম সালিমী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, আমি একদা হযরত আবু উসমান মাগরিবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে দেখতে গেলাম। সেখানে একটি ষাঁড় দ্বারা লোকজন কূপ থেকে পানি তুলছিলেন। আবু উসমান আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এই ষাঁড়টি কী বলছে শুনতে পাচ্ছো?' জবাব দিলাম, 'জি না।' তিনি বললেন, 'আল্লাহ! আল্লাহ!'

সামা'র [শ্রবণকারী] লোক তিন ধরনের:

১. হাক্বিক্বাতের পাত্র। এরা সামা'য় নিজের মধ্যে আল্লাহর বাণী শুনেন।

২. প্রয়োজনের পাত্র। এরা সামা'র কবিতার অর্থ অনুধাবন করে হৃদয় দ্বারা আল্লাহকে ডাকেন।

৩. নিঃসঙ্গ ফুকারা। এরা যাবতীয় জাগতিক সম্বন্ধ ও বিপর্যয় থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছেন। তাদের সামা' হচ্ছে হৃদয়ের উত্তমতা। তারা [আল্লাহর] নৈকট্যের নিরাপত্তায় আছেন।

সামা' সম্পর্কিত আদব-কায়দা

সামা'র প্রথম আইন হলো, এরূপ অনুষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্য সম্পর্কে আন্তরিক থাকা চাই।

ক. এতে কোনো ধরনের যৌনাকর্ষণমূলক আকাঙ্ক্ষা থাকলে পরিহার করতে হবে।

খ. সদিচ্ছা সম্পর্কিত আন্তরিকতার দাবী, হালের উন্নতির ইচ্ছা এবং আল্লাহর অনুগ্রহ কামনা- এ তিনটি বিষয়ের সমন্বয় ঘটলে পরেই সামা' থেকে উপকার আসতে পারে- এমনকি কোনো বিশেষ শায়খ বা সামা'র বিশিষ্ট ভাইগণ উপস্থিত না থাকলেও।

যদি সামা'য় আন্তরিকতা এবং যৌনাকর্ষণ আছে বলে পরবর্তীতে ধরা পড়ে তাহলে এ থেকে পবিত্র হতে হবে:

১. ধৈর্যধারণে আন্তরিকতার মাধ্যমে।

২. যৌনাকাঙ্ক্ষা ও লালসা থেকে মুক্তির জন্য আল্লাহর দরবারে ক্ষমা প্রার্থনার মাধ্যমে।

৩. নফল নামাযের উপর অগ্রাধিকারের মাধ্যমে।

যদি সামা'র অন্তর্ভুক্ত হয়:

১. নিষিদ্ধ বিষয়, যেমন:

ক. বিন্দু পরিমাণ যুলুম।

খ. মহিলাদের কাছে থাকা।

গ. দাড়িবিহীন সুদর্শন বালকদের উপস্থিতি।

২. ঘৃণ্য বস্তু কিংবা বেমানান ব্যক্তি, যেমন:

ক. ঐ ধরনের জাহিদের উপস্থিতি যার কোনো সম্পর্ক এই দলের সঙ্গে নেই। যিনি সামা'তে কোনো সুফল পান না।

খ. কোনো জাগতিক শাসক যার প্রতি সম্মানপ্রদর্শন জরুরী।

গ. ঐ ধরনের ব্যক্তির উপস্থিতি, যে ভুলভাবে 'ওয়াজদ' এর ব্যাখ্যা দেয়। উপস্থিত অন্যান্যদের মধ্যে ভুল তাওয়াজ্জুদের মাধ্যমে সৃষ্টি করে উত্তেজনা।

তাহলে, এটা জরুরী হয়ে যাবে যে, এরূপ কোনো সামা'র আসর সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করা।

সামা'র আসরে আগত ব্যক্তি সম্মানের সাথে বসবেন। সামা'র সময় স্বেচ্ছায় নাচানাচি বা দেহ হেলান-দোলান থেকে বিরত থাকবেন। বিশেষ করে মুর্শিদ বা শায়খের সামনে এরূপ করা হবে বিরাট গর্হিত কাজ। ওয়াজদ এর সামান্য সুখানুভূতিতে গাছাড়া দেওয়া যাবে না। ইশকের যৎসামান্য পবিত্র সুরাপানেই একেবারে মাতাল হওয়ার কোনো মানে নেই। স্বেচ্ছায় শাহকাত [গুণগুণি শব্দ উচ্চারণ] কিংবা জা'ক [চিৎকার] করাও সঠিক নয়।

যদি ওয়াজদ কিংবা হালের অবস্থা না আসা সত্ত্বেও কেউ এগুলো অনুভবের ভান করে [নাউযুবিল্লাহ], তাহলে তা অবশ্যই মুনাফিকী ও মহাপাপের শামিল। এটা হচ্ছে সর্বাধিক ঘৃণ্য দোষের কাজ।

হযরত শিবলী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির সাথী মুহাদ্দিস হযরত আবুল কাসিম নাসিরাবাদী রাহিমাহুল্লাহর সময়, খুরাসানের শায়খগণ সামা'র আসর করতেন। একদিন হযরত আবু উসমান হিরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির মুরীদ [যিনি হযরত জুনাইদকেও দেখেছেন] হযরত আবু আমর বিন নাজিদ রাহিমাহুল্লাহ হযরত নাসিরাবাদী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির সঙ্গে একটি সামা'র আসরে একত্রিত হলেন। নাজিদ শেষোক্ত শায়খকে তিরস্কার করলেন। নাসিরাবাদী বললেন: "এটা তো একটি জলসা যেখানে এক ব্যক্তি আইনসঙ্গত গজল পরিবেশন করবে, আর বাকি সব তা নীরবে শুনবে। এরূপ করা হবে ঐ জলসা থেকে উত্তম যেখানে সবাই কলঙ্কপূর্ণ বক্তা!"

আবু আমর বললেন: "হে আবুল কাসিম! সামা'য় নচাচড়া হচ্ছে পাপের কাজ! এতে এই আছে সেই আছে।"

আবু আমরের মন্তব্যের ব্যাখ্যা হলো, সামা'য় যে ভুল হয় তার দ্বারা আরো অনেক ভুলের জন্ম নেয়:

* ভুলবশত মহাবিশ্বের প্রতিপালকের ওপর অপবাদ আরোপ (নাউযুবিল্লাহ)। কারণ সামা'র সময় মুতাওয়াজিদ্ ব্যক্তির মধ্যে যে ওয়াজদ এর অবস্থা সৃষ্টি হয় তা একমাত্র আল্লাহর একান্ত অনুগ্রহ ছাড়া আর কিছু নয়। [সুতরাং ওয়াজদ এর অবস্থা ভঙ্গি করে দেখানো- স্বয়ং আল্লাহর সাথে প্রতারণার শামিল।]
* কৃত্রিম হাল সৃষ্টি করে অন্যদেরকে প্রতারিত করা হয়। কারণ প্রবঞ্চণার অপর নাম প্রতারণা। আর প্রতারণা হচ্ছে ঘৃণ্য সৃষ্টির সূত্র।
* সাধু ব্যক্তিদের অনুসারীদের মনোবল ভেঙ্গে যায়। এতে তারা সত্যিকার ওলিদের সান্নিধ্য থেকে বঞ্চিত হয়ে পড়ে। আর এই সান্নিধ্যহীনতা হলো পাপকার্যে জড়িয়ে পড়ার মূল কারণ।

সত্যিকার ওয়াজিদ্ [যার মধ্যে ওয়াজদ আসে] ব্যক্তিদের রাস্তা হলো:
যতোক্ষণ পর্যন্ত উষ্ণ আবেগ তাদের মধ্যে অনুভূত না হবে ততক্ষণ তারা সামা'য় নড়াচড়া করবেন না। তাদের মধ্যে একমাত্র ঐ সময় নড়াচড়া জেগে ওঠবে যখন এ থেকে বেঁচে থাকা আর সম্ভব হবে না।

তাওয়াজুদ হলো:
ওয়াজদ ও হাল এর অবস্থা ছাড়াও হৃদয় ও নফসে আম্মারার বাসনাকে সামা'র সঙ্গীতের সাথে মৃদু নড়াচড়া দ্বারা রহিত করার চেষ্ট করা। এর ফলে নফস তার কর্ম থেকে এবং হৃদয় তার কুমন্ত্রণা থেকে বিরত থাকে। এভাবে হৃদয় আল্লাহকে অনুসন্ধানের আকাঙ্ক্ষা দ্বারা ব্যস্ত হয়।
যদিও শায়র শ্রবণকালে মৃদু নাচন হতে পারে আইনসঙ্গত বিনোদন, কিন্তু হক্কানী ব্যক্তি মহিমান্বিতদের নিকট এটা নিষ্ফল কর্ম বৈ নয়। অন্যদিকে খেদান্বেষার সহায়ক এই নিষ্ফল কর্মগুলো হচ্ছে আনুগত্যতার মূল। সুতরাং বলা যায়, নিস্ফল কর্মগুলোর মধ্যে এই নিষ্ফল কর্ম অনেকটা সত্যসিদ্ধ।

তাওয়াজুর মধ্যে মুতাওজিদের দৃঢ়তা সম্ভবত ওয়াজদের একটি অংশ, সুতরাং সে তার হাল থেকে কিছুটা উপকৃত হতে পারে। এরূপ কর্ম যদিও প্রাথমিক পর্যায়ের সালিকদের জন্য বৈধ কিন্তু তা শায়খ পর্যায়ের হালের ক্ষেত্রে মানানসই নয়। কারণ তাঁদের হাল বাইর, ভেতর উভয় দিক থেকে পবিত্র, নিষ্কলুষ সত্য।

বলা হয়ে থাকে, হযরত জুনাইদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহির সময় একজন যুবক যার মধ্যে নিষ্ঠার প্রবাল্য ছিলো। কিন্তু সামা'র সময় সে চিৎকার দিত। একদিন শায়খ জুনাইদ তাকে নিষেধ করে বললেন: 'এখন থেকে যদি তুমি আবার চিৎকার দাও তাহলে আমাদের থেকে দূরে চলে যাবে।'
যুবক এরপর থেকে সামা'র সময় চিৎকার দেওয়া বন্ধ করে দিল। কিন্তু তার হালে বিরাট পরিবর্তন হতে লাগলো। শরীরের প্রতিটি লোমকূপে ধৈর্যধারণের প্রতিক্রিয়া আত্মপ্রকাশ করতে শুরু হলো। অবশেষে একদিন সে এমন চিৎকার দিলো যে, এতেই তার প্রাণবায়ু বের হয়ে গেল।

চিৎকার সম্পর্কিত নিময়-কানুন হলো:

হালের অবস্থা ও শক্তির কারণে কেউ যদি চিৎকার দেওয়া থেকে বিরত থাকতে অপারগ হয় তাহলে তা গ্রহণযোগ্য। হালের কারণে নিয়ন্ত্রণহীন না হলে:

ক. সামা'র মধ্যে নড়াচড়া (নাচানাচি) বৈধ নয়।

খ. স্বেচ্ছায় চিৎকার দেওয়া বৈধ নয়।

গ. স্বেচ্ছায় নিজের জামা-কাপড় ছিলে ফেলা বৈধ নয়।

সঙ্গীত পরিবেশনকারীকে নিজের খিরক্কা প্রদানের ক্ষেত্রে নিয়ম হলো, নিয়তের মধ্যে বিশুদ্ধতা থাকবে। এতে কোনো ধরনের মুনাফিকী থাকলে চলবে না। গায়ককে শ্রবণকারীর পক্ষ থেকে দু'ধরনের খিরক্কা প্রদান করা যেতে পারে:

১. খিরক্কায়ে সাহীহা - ফেরতযোগ্যহীন খিরক্কা।

২. খিরক্কায়ে মুমাযজাকা - ফেরতযোগ্য খিরক্কা।

উপরে বর্ণিত 'ফেরতযোগ্যহীন খিরক্কা' সম্পর্কে আইন হলো:

(১) ওয়াজিদ [যিনি খিরক্কা দেবেন] যদি নিয়ত করেন নিজের খিরক্কা গায়ককে বরকত হিসাবে প্রদান করবেন তাহলে এতে অন্যদের কোনো কিছু বলার অধিকার নেই।

(২) ওয়াজিদের কোনো বিশেষ নিয়ত না থকলে তিনি গায়ককে অথবা যাকে ইচ্ছে নিজের খিরক্কা প্রদান করতে পারেন। এ ব্যাপারে কারো কিছু বলার অধিকার নেই, কারণ তিনি স্বীয় অন্তর্দৃষ্টি থেকে এ কাজ করবেন।

(৩) উপস্থিত সবাই যদি মুরীদ হন ও তাদের মুর্শিদ অনুপস্থিত না থাকেন, তাহলে তারা গায়ককে খিরক্কা দেওয়ার কারণ হলো: তাদের মধ্যে 'ওয়াজদ' সৃষ্টির মূল সূত্র হচ্ছে [গায়কের] কবিতা।

কেউ কেউ বলেন:

(ক) খিরক্কার ওপর সকল অংশগ্রণকারীর মালিকানা আছে। কারণ ওয়াজদের সূত্র শুধুমাত্র গায়কের কবিতা নয়, এর সাথে সম্পৃক্ত আছে সকলের সমন্বিত বরকতও।

(খ) গায়ক যদি অংশগ্রহণকারী থেকে আলাদা হয়ে থাকেন তাহলে তার হিস্যা আছে। অন্যথায় তিনি অংশ পাওয়ার যোগ্য নন।

(গ) যদি গায়ক ভাড়াটিয়া হন তাহলে তিনি কিছু পাওয়ার যোগ্য নন। অন্যথায় অংশ পাবেন।

(ঘ) যদি কিছু আল্লাহপ্রেমিক কোনো উপহার [গায়ককে] প্রদান করেন এবং এর দ্বারা উপস্থিত সবাই সন্তুষ্ট থাকেন, তাহলে সকলেই নিজেদের খিরক্বা [গায়ককে প্রদানের পরও] ফেরত নিতে পারবেন। তবে উপহারসামগ্রী একমাত্র গায়কের জন্য খাস থাকবে।

(ঙ) সাধারণত খিরক্বা প্রদানের পর তা ফেরত পাওয়ার চেষ্টা কারোর পক্ষে বৈধ নয়।

খিরক্বায়ে মুমাযজানা বা ধারদেওয়া খিরক্বার ব্যাপারে আইন হলো:

যখন সামা'য় নিমজ্জিত ব্যক্তি হালের সময়কার অগ্রপশ্চাদ-বিবেচনাহীনতা ও নিয়ন্ত্রণের মধ্যে গ্রেফতার হেতু নিজের খিরক্বা ছুড়ে মারেন, তাহলে তা অংশগ্রহণকারী ভাইদের মধ্যে বিভক্ত করে নিতে পারেন। বিভিন্ন ধরনের অংশগ্রহণকারীর প্রতি একে অন্যকে দয়ার নজরে দেখতে হবে। সামা'র সময় অনুপস্থিত কেউ থাকলেও তাকে এর (প্রদানকৃত খিরক্বার) অংশীদার করা উচিৎ।

যদি ছুড়ে ফেলা খিরক্বার মধ্যে কিছু খিরক্বায়ে সহীহা থাকে এবং কিছু থাকে খিরক্বায়ে মুমাযজাকা তাহলে উপস্থিত শায়খের অনুমতিক্রমে দ্বিতীয় প্রকারের খিরক্বাও ছিড়ে সবার মধ্যে বন্টন করে দেওয়া উত্তম। খিরক্বা ছিড়ে উপস্থিতদের মধ্যে বন্টন সম্পর্কে একটি হাদিস আছে যার বর্ণনাকারী হযরত আনাস বিন মালিক রাদ্বিআল্লাহু আনহু। তবে এ সম্পর্কে ভিন্নমতও আছে।

উক্ত হাদিস দ্বারা যদি সামা' (সঙ্গীত), নড়াচড়া, কাপড় ছেড়া ও উপস্থিত সকলের মধ্যে বন্টন করা ইত্যাদির বৈধতা নিশ্চিত করা যায়, তাহলে তা হবে সুফিদের জন্য সর্বোত্তম দলীল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

খিরক্কা [দরবেশের আলখাল্লা]

সুফিদের একটি ঐতিহ্য হলো খিরক্কা বা আলখাল্লা পরিধান। সাধারণত শুরুতেই মুর্শিদ তাঁর যোগ্য মুরীদকে খিরক্কা পরার নির্দেশ দিয়ে থাকেন। এটা পরিধান সুন্নাত হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে হযরত উম্মে খালিদ রাদ্বিআল্লাহু আনহা সম্পর্কিত একটি হাদিস থেকে: 'একদা রাসূলে মকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট কিছু জামাকাপড় নিয়ে আসা হলো। এর মধ্যে একখানা ছোট্ট কাঁথাও ছিলো। নবীজী এটা হাতে তুলে নিয়ে উপস্থিত সকলকে জিজ্ঞেস করলেন: কে এই কাঁথাখানা গায়ে পরবে? সকলেই নীরব রইলেন। তিনি বললেন, আমি এ'টি উম্মে খালিদকে প্রদান করলাম। সুতরাং হযরত উম্মে খালিদ রাদ্বিআল্লাহু আনহাকে ডাকা হলো। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাঁথা দ্বারা তাঁকে আবৃত করে দিলেন। এই কাঁথাটি ছিলো হলুদ ও লাল রংয়ের ডোরাযুক্ত। এরপর নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দৃষ্টিপাত করে মন্তব্য করলেন, "হে উম্মে খালিদ! এটা তো খুব চমৎকার।"

সুফিদের খিরক্কা ও উক্ত হাদিসে বর্ণিত কাঁথার মধ্যে পার্থক্য থাকলেও এটা পরিধানের মধ্যে উপকার আছে। তবে খিরক্কা পরার জন্য হাদিসে সুস্পষ্ট কোনো নির্দেশ আসে নি- তা যদি হতো, তাহলে খিরক্কা পরা সবার জন্য সুন্নাত হতো। খিরক্কা পরিধানে উপকার ছাড়া কোনো অপকার নেই এবং তা সুন্নাতের বিরোধীও নয়। সুতরাং খিরক্কা পরা একটি প্রশংসনীয় কাজ।

তরীকতপন্থীদের জন্য নিচের বিষয়গুলো অনুসরণ অত্যন্ত উত্তম আমল:

১. সচরাচর অভ্যাস পরিহার করা ও স্বাভাবিক নফসানী ফুর্তি-আনন্দ থেকে বিরত থাকা। যেমন, পানাহার ও স্ত্রী-সহবাসে নিহিত আছে বিরাট আকর্ষণ ও ফুর্তি-

আমোদ। অনুরূপ পরিধান থেকেও মানুষ আনন্দবোধ করে। আকর্ষণীয় জামাকাপড়ও হতে পারে যৌনাকর্ষণের উপাদান।

২. মানুষের চিরদুশমন শয়তান ও সমসাময়িক সমাজে প্রতিষ্ঠিত পাপকার্যের বিরোধিতা করা। এসব ব্যাপার ভালো সামাজিকতাকে কলুষযুক্ত করে। কোনো মুরীদের মাঝে যখন পরিধান বদলের কারণে দৃশ্যত পরিবর্তন আসে, তখন তার সমপর্যায়ের লোকজন ও সাথীরা তার থেকে দূরে সরে পড়ে। কারণ খিরক্বা হচ্ছে মুরীদের জন্য শায়খের ভালোবাসার নিদর্শন। এর দ্বারা শয়তানও শঙ্কিত হয়। হাদিসে আছে আল্লাহপ্রেমিকদের শয়তান ভয় করে। মুরীদের জন্য ভালো সঙ্গলাভ একান্ত জরুরী। এ থেকে সে লাভ করে উত্তম চারিত্রিক রঙ। পাপিষ্ঠদের থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া উত্তম সামজে গ্রহণীয় হওয়ার পূর্বশর্ত। এরপরও, কয়লা দ্বারা কৃষ্ণ রং ধারণকৃত পরিধেয় সহজে নতুন রঙে রঞ্জিত হয় না। এজন্য অবশ্যই কয়লার ময়লা প্রথমে ছাড়াতে হবে।

৩. শায়খ কর্তৃক মুরীদের অন্তরকে আন্দোলিত করা সম্ভব হয় বাহ্যিক প্রভাব হেতু। যতক্ষণ পর্যন্ত মুরীদের অভ্যন্তর আন্দোলিত হওয়ার যোগ্যতা লাভ করবে না এবং মুর্শিদের ওপর কোনো ধরনের সন্দেহ পোষণ করবে, ততক্ষণ তার মধ্যে শায়খের প্রতি বাহ্যিক আনুগত্যতাও পরিশুদ্ধ হবে না।

৪. মুরীদের নিকট সর্বাধিক খুশির খবর হলো, আল্লাহ তা'আলা তাকে গ্রহণ করেছেন। কারণ [মুর্শিদের নির্দেশে] খিরক্বা পরা হলো মুর্শিদের পক্ষ থেকে গ্রহণীয় হওয়ার ইঙ্গিত। আর এটা অবশ্য আল্লাহর পক্ষ থেকে অনুগ্রহেরও ইশারা। খিরক্বা মুরীদের প্রতি ভালোবাসা হেতু পরার নির্দেশ আসে। সুতরাং মুরীদ জানে, এটা আল্লাহর দয়া- তিনি তাকে এ রাস্তার সালিক হিসাবে গ্রহণ করেছেন। এরই মাধ্যমে সে তার মুর্শিদের সঙ্গে সম্পৃক্ত হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করলো। সে এ রাস্তার আয়না পেয়ে গেছে যাতে দৃশ্যমান হবে রাস্তাশেষের ঔজ্জ্বল্যতা।

শায়খের আত্মার সঙ্গে মুরীদের আত্মার পরিচিতি অর্জন হলো জ্ঞাতিত্ব সৃষ্টির চিহ্ন। ঠিক যেভাবে হাদিসে বলা হয়েছে। এছাড়া খিরক্বা পরানোর মধ্যে মুর্শিদের প্রতি মুরীদের আকর্ষণ ও মুরীদের প্রতি মুর্শিদের ভালোবাসার প্রকাশ ঘটে।

উপরে ব্যাখ্যাত এই দু'টি (৩ ও ৪) বিষয় একত্রিত হওয়ার ফলেই উন্নত স্তর (হাল) লাভ হয়।

খিরক্বার ধরন দু'টি:

(ক) কামনার খিরক্বা

(খ) অনুগ্রহের খিরক্বা

(ক) কামনার খিরক্বা

নূরান্বিত দূরদৃষ্টি ও বুদ্ধিমত্তা দ্বারা মুর্শিদ যখন মুরীদের স্তর নিরূপণ করেন ও এটা তাঁর নিকট স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, শাগরিদ প্রভুপ্রাপ্তির ইচ্ছার উপর সম্পূর্ণ একনিষ্ঠভাবে আন্তরিক, তখন তিনি তাকে দান করেন খিরক্বা। এরই মাধ্যমে মুর্শিদের পক্ষ থেকে মুরীদের প্রতি সুসংবাদের ইঙ্গিতও দেওয়া হয়। ফলে মুরীদের হৃদয়নেত্র আল্লাহর পক্ষ থেকে হিদায়াতের আলো দ্বারা নূরান্বিত হয়ে ওঠে। আর এই খিরক্বা হলো তার বাহক। হযরত ইয়াকুব আলাইহিসসালাম এর চোখ এভাবেই স্বীয় পুত্র হযরত ইউসুফ আলাইহিসসালামের জামার মাধ্যমে পুনরায় দর্শনশক্তি লাভ করে।

(খ) অনুগ্রহের খিরক্বা

শায়খের সুদৃষ্টি ও অনুগ্রহের আশায় কোনো মুরীদ নিজের জামা পরিত্যাগ করে খিরক্বা পরার ইচ্ছা করতে পারেন। এরূপ ইচ্ছাপোষণের সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকে মুর্শিদের ইচ্ছার প্রতিফলন। তবে দু'টি বিষয় অবশ্যই অনুসরণ করা জরুরী:

(১) শরীয়তের ওপর সম্পূর্ণরূপে অটল থাকা।

(২) তরীকতপন্থীদের নিরাপত্তা ও সম্মানপ্রদর্শন নিশ্চিতকরণ। এরই মাধ্যমে মুরীদ তাঁদের জ্ঞাতিভাই হওয়ার মর্যাদা লাভ করবেন। এতে খিরক্বা পরার

ইচ্ছা ও খোদাপ্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষায় আন্তরিকতা প্রমাণিত হবে। অন্যথায় খিরক্বা পরা বৈধ নয়।

উপরোক্ত দু'ধরনের খিরক্বা ছাড়াও কেউ কেউ আরেক ধরনের খিরক্বার কথা বলেন যাকে '**পবিত্রতার খিরক্বা**' বা '**খিলাফতের খিরক্বা**' বলা হয়। শায়খ যখন তাঁর শাগরিদের মধ্যে পবিত্রতার প্রভাব লক্ষ্য করেন, নিজের মতো শায়খের পর্যায়ে উন্নীত হওয়ার যোগ্যতা তার মধ্যে দেখতে পান, তখন তিনি নিজের খলিফা হিসাবে মুরীদকে নিযুক্ত করে থাকেন। এসময় নিদর্শন হিসাবে নিজের খিরক্বাও পরিয়ে দেন। এটাই হচ্ছে খিলাফতের খিরক্বা।

রঙিন খিরক্বা

রঙিন খিরক্বা পছন্দ হচ্ছে শায়খদের একটি প্রশংসনীয় আমল। তবে সুন্নাত আমল হলো সাদা জামা। এ ব্যাপারে সুফিদের মধ্যে কোনো মতানৈক্য নেই। তবে এটাও সত্যি যে, সাদা কাপড় বেশি বেশি ধৌত করতে হয়। ফলে অনেক সময়ও নষ্ট হয়ে যায়। সুতরাং যারা সর্বদাই আল্লাহর ধ্যান ও উত্তম আমলের মধ্যে নিমগ্ন থাকেন তাদের জন্য এই সময়টুকু বিফলে যায়। এদের ক্ষেত্রে রঙিন জামাকাপড় পরিধান অনেকটা উত্তম। কারণ কাপড় পরার আমল থেকে নফলের আমলের মধ্যে অধিক প্রতিদান পাওয়া যাবে। অধিক উত্তম বস্তু অর্জনে যদি স্বল্প উত্তম বস্তুকে বিসর্জন দিতে হয়, তাহলে সেটাই উত্তম।

কালো রং কলুষতার বিরুদ্ধে উত্তম হলেও সুফিরা নীল রংকে বেশি পছন্দ করেন। সুফিরা সাধারণত পরিধেয় বস্ত্রের রং নিজের হালের সাথে সামঞ্জস্যশীল রেখে পছন্দ করেন।

কালো রং তার জন্য খাঁটে যে লোভ-লালসা ও শাহওয়াতের অন্ধকারে নিমজ্জিত আছে। তার ওয়াক্তও থাকে আঁধারে ঢাকা।

অপরদিকে আকাঙ্ক্ষার হালে পতিত ব্যক্তির মাঝে ইচ্ছার আলোকরশ্মি হেতু অস্তিত্বের অন্ধকারে পদদলিত হয়ে যয়, তাই তার জন্য কালো রংয়ের পরিধেয় প্রযোজ্য নয়। তার জন্য নীল রংয়ের বস্ত্র মানানসই। এ রঙে আছে আলো-আঁধারের মিশ্রণ। আছে পবিত্রতা ও কদর্যের মিলন।

মোমবাতির অগ্নিশিখায় থাকে দু'টি অংশ: নিষ্কলুষ আলো ও কলুষযুক্ত আঁধার। উভয়টির মিলনস্থলের রং হলো নীল।

সাদা পরিধেয় শায়খের জন্য খাস। কারণ তিনি তো লোভ-লালসা ও শাহওয়াত [নফসে আম্মারা] থেকে মুক্ত হয়েছেন। এই কথাগুলো কিন্তু যথাযথপ্রায়।

তরীকতপন্থী সালিক তিন ধরনের

(ক) মুবতাদিয়্যান [প্রথম দল]: তাদের স্তর হলো ফানা ফিশ-শায়খ [শায়খের মধ্যে নিজের ইচ্ছার বিসর্জন]। তাদের পরিধেয়, ভালো-মন্দ, হালাল-হারাম সবকিছু শায়খের ইচ্ছাধীন।

(খ) মুতাওয়াসসিতান [মধ্যম দল]: তারা হলেন আল্লাহর ইচ্ছার মধ্যে বিলীন। তাদের নিজস্ব কোনো ইচ্ছাই অবশিষ্ট নেই। যে সময় যেটাই ঘটে তাতে তারা সদারাজী।

(গ) মুনতাহিয়্যান [শেষের দল]: তারা আল্লাহর মাঝে বিলীন [ফানাফিল্লাহ্]। তাদের ইচ্ছা স্বয়ং আল্লাহর ইচ্ছা।

যখন সত্যিকার কোনো মুরীদ বিশুদ্ধ আন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন মুর্শিদের ইচ্ছার ওপর নিজেকে বিলীন করে ও তাঁর নিকট আত্মসমর্পিত হয়, মুর্শিদ তাকে স্বাভাবিক প্রবণতা ও লোভ-লালসার আকর্ষণ থেকে মুক্ত করেন। তাকে দিকনির্দেশা করেন ঈমান ও দ্বীনের সকল বিষয়-আসয় ও আমলের ওপর।

মুর্শিদ যদি মনে করেন, বিশেষ বস্ত্রের প্রতি মুরীদের আকর্ষণ সৃষ্টি হয়েছে, তাহলে তিনি তাকে কাছে ডেকে এনে এটা পরিবর্তন করে দেন। তিনি যদি লক্ষ্য করেন, জমকালো জামাকাপড়ের প্রতি মুরীদ ঝুঁকে পড়েছে, তাহলে তিনি তাকে পরিয়ে দেন মোটা সুতার খিরক্বা। তিনি যদি দেখেন, মুরীদ নিজের কামালতি জাহির করার উদ্দেশ্যে মোটা সুতার খিরক্বা পরতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে, তাহলে তিনি তাকে পরিয়ে দেন মশ্রিণ সুতার জামা। তিনি যদি লক্ষ্য করেন, তার মুরীদ কোনো বিশেষ রং বা আকারের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে, তাহলে তিনি এটা তার জন্য নিষিদ্ধ করেন। মোটকথা, সবক্ষেত্রেই পরিধেয় বস্ত্রের রং ও আকার কী হবে তা নির্ভর করে মুর্শিদের অন্তর্দৃষ্টির ওপর।

কিছু শায়খ মুরীদের বস্ত্র পরিবর্তনের নির্দেশ দেন না। তাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকে মুরীদের হালকে লুকিয়ে রাখা ও এর বিকাশকে ঢেকে রাখার মধ্যে। শায়খরা মূলত চিকিৎসকের মতো। মুরীদরা রোগির মতো, একেক জনের আছে একেক ধরনের রোগ যা মুর্শিদ সনাক্ত করেছেন। সুতরাং সঠিক ঔষধ দিয়ে রোগ থেকে মুরীদকে মুক্ত করেন। মুর্শিদের দিকনির্দেশনা সাধুতা ও উপদেশনির্ভর। তাদের ভিত পরিত্রাণ ও সাফল্যের রাস্তার ওপর প্রতিষ্ঠিত।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

খিলওয়াত [নির্জনবাস]

নির্জনবাস পরবর্তী যুগের সুফিদের অভ্যাস। এটা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে ছিলো না। সে যুগে 'সুহবাত' বা সান্নিধ্য ছিলো সকল উত্তমের মধ্যে উত্তম। সাহাবায়ে কিরাম সুহবাত থেকেই সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী হয়েছিলেন। সাহাবায়ে কিরাম অর্থই হচ্ছে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুহবাত লাভকারী সৌভাগ্যবান একদল মানুষ। তাঁদের আত্মা নবুওয়াতের মাহাত্ম্য দ্বারা উদ্ভাসিত হয়, চারিত্রিক সাধুতা ও পবিত্রতা তাঁদেরকে বেষ্টন করে ফেলে। হৃদয় হয়ে ওঠে দুনিয়াবিমুখ, প্রশান্তি আসে অন্তরে ঈমানের নিশ্চয়তার দূরদৃষ্টি হেতু, আল্লাহপ্রেমের অমিয় সুধায় পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে অন্তরাত্মা- যে প্রেমে ছিলো পবিত্রতা ও আনুগত্যতার প্রচণ্ড আকর্ষণ।

নবুওয়াতের সূর্য অস্ত যাওয়ার পর, সাহাবায়ে কিরামের আন্তরাত্মায় ক্রমান্বয়ে কম্পন শুরু হয়। মতানৈক্য আত্মপ্রকাশ করে। অবশেষে তা সে পর্যন্ত বিস্তৃত হয় যে, সুহবাত থেকে অধিক ফলদায়ক ও প্রিয় হয়ে ওঠে খিলওয়াত বা নির্জনবাস।

ঈমান সংরক্ষণে জুরুরী হয়ে ওঠে '**খানক্বাহ**' এবং নির্জনবাস। হযরত জুনাইদ বাগদাদী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, যদিও সুন্নাতের পূর্ণাঙ্গ অনুসরণের যুগে খিলওয়াত ছিলো না, কিন্তু এর পূর্বের যুগে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহপ্রেম ও আনুগত্যের প্রাবল্য হেতু খিলওয়াত অবলম্বন করেন। তিনি হিরা পর্বতের গুহায় যেতেন ও রাতভর একাকী আল্লাহর জিকির ও ধ্যানের মধ্যে নিমগ্ন থাকতেন। খিলওয়াতের পক্ষে এই হাসিদই সর্বাধিক শক্ত। তবে চল্লিশ দিনের চিল্লা বা খিলওয়াতের পক্ষেও আল্লাহর কালাম ও রাসূলের হাদিস বিদ্যমান।

হযরত মূসা আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে আল্লাহ তা'আলা যখন কথাবার্তা করার সিদ্ধান্ত নেন তখন তিনি তাঁকে নির্দিষ্ট স্থান ও সময় বলে দিলেন। আল্লাহ বলেন: "ত্রিশ দিন ও ত্রিশ রাত উপবাস থেকো।" পরে আরো দশদিন যোগ করলেন। হযরত মূসা আলাইহিসসালাম এ সময়ের মধ্যে পানাহার করেন নি। তিনি আল্লাহর ধ্যান ও উপাসনার মধ্যে কালক্ষেপণ করেন। এভাবেই আল্লাহর সঙ্গে আলাপচারিতার যোগ্য পাত্রে পরিণত হন।

যেহেতু আল্লাহর নৈকট্য ও তাঁর সাথে কথা বলার জন্য হযরত মূসা নবীরও খিলওয়াত বা নির্জনবাসের প্রয়োজন হয়েছিল, তাই এটা সকলের জন্যই জরুরী। এমন কি সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্যও নির্জনবাস মূখ্য ছিলো। তিনি:

(১) সুহবাত ত্যাগ করেন।

(২) আল্লাহর সঙ্গলাভের (বা তাঁর সাথে কথা বলার) জন্য নির্জনবাস করেন।

(৩) মানুষের সঙ্গ ত্যাগ করেন।

(৪) দৈনিক খাবার কমিয়ে আনেন।

(৫) সর্বদা আল্লাহর জিকির ও ধ্যানে থাকেন।

এ সবই খিলওয়াতের দলিল। সুতরাং আল্লাহ অন্বেষীদের জন্য খিলওয়াত অবশ্যই জরুরী- এমনকি ওয়াজিব হিসাবে সাব্যস্ত হয়েছে। তবে ঠিক কতদিন এটি পালনীয় সে ব্যাপারে শরীয়তে কোনো দিকনির্দেশনা আসে নি। এ ব্যাপারে সঠিক জ্ঞান শুধুমাত্র নবী, রাসূল, সালিহীন ও সিদ্দিকীনদের মধ্যে বিধ্যমান।

(আওয়ারিফুল মা'আরিফের লেখক শাইখুল ইসলাম হযরত উমর সুহরাওয়ার্দি বলেন) "আল্লাহ তা'আলা যখন আদম আলাইহিসসালামকে তাঁর নিজের খিলওয়াতের জন্য নির্বাচিত করেন ও বেহেশত আবাদ করিয়ে এ পৃথিবীর জমিনে খলিফা হিসাবে পাঠাতে চাইলেন, তখন তিনি জমিনের বিভিন্ন উপদানে মিশ্রিত বস্তু যা শধুমাত্র পৃথিবীর জন্যই খাস, একত্রিত করলেন। এরপর এগুলোকে চল্লিশটি

প্রাতঃকাল পর্যন্ত সময় দিলেন যাতে তা সজিব হয়ে ওঠে। প্রত্যহ ভোরে এই বস্তুর মধ্যে একটি করে গুণ সন্নিবেশিত হয় যার কারণে তা দুনিয়ার প্রতি আকর্ষিত হয়ে ওঠে। আর এসব দুনিয়া-আকর্ষণের গুণাবলী শেষ পর্যন্ত চিরন্তন (কিদাম) এর সম্মুখে একেকটি পর্দা হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। প্রতিটি পর্দাই হলো অদৃশ্য জগত থেকে দূরে সরে পড়ার সামিল। প্রত্যেক দূরত্ব হলো বস্তুজগতের নিকটস্থ হওয়ার কারণ। অবশেষে পর্দা স্তুপে পরিণত হয়।”

চল্লিশ প্রাতঃকাল নিষ্ঠার সাথে নির্জনবাসে কাটানোর মধ্যে হিকমাত বিদ্যমান। যেমন: নির্জনবাসের প্রত্যেকদিন ভোরে একটি করে পর্দা অপসারিত হবে। আল্লাহর নৈকট্যের স্তর একধাপ এগিয়ে যাবে। সুতরাং চল্লিশ প্রাতঃকালে চল্লিশটি পর্দাই উঠে যাবে। এ থেকে মানবস্বভাব দূরত্ব থেকে নৈকট্যের স্তরে পৌঁছুয়ে যাবে যা তার আপন ভূমি। অর্থাৎ মাহাত্ম্য ও সৌন্দর্যের মূল, জ্ঞানের নির্যাস ও মা’রিফাতের চারণভূমিতে ফিরে যাবে। এ থেকেই অনন্ত বিশালতার অন্তর্দৃষ্টি - যার নেই শুরু কিংবা শেষ, বিশুদ্ধভাবে যথার্থ ও অঙ্কিত হবে। পরিস্কার হবে নিষ্কলুষ পবিত্র জগৎ থেকে নিম্নজগতের কদর্যতার পার্থক্য। হিকমাতের মূল হৃদয় থেকে বোরিয়ে এসে জিহ্বায় স্থানান্তরিত হবে।

খিলওয়াতের বৈশিষ্ট হলো হিকমাতের প্রকাশের অবস্থার সংরক্ষণ। আর হিকমাতের প্রকাশের মধ্যে বিদ্যমান পর্দা উন্মোচন ও সন্দেহহীন স্পষ্টকরণের প্রমাণে। খিলাওয়াত হচ্ছে কর্মকারের কর্মশালার মতো। সেখানে অগ্নির কাঠিন্যতা নফসে আম্মারাকে গলিয়ে-পিটিয়ে কলুষমুক্ত করে। ফলে এরই মধ্যস্ত আয়না হয়ে ওঠে পরিস্কার। আর এ আয়নায় ভেসে ওঠে হাক্বিক্বাতের নূর। কারণ নফসের বিরোধী উপাদানসমূহ হলো:

(ক) কম খাওয়া।

(খ) কম কথা বলা।

(গ) মানুষের সাথে কম মেলামেশা।

(ঘ) কম ঘুমানো।

(ঙ) সর্বদা জিকির করা।

(চ) কুমন্ত্রণা পরিত্যাগ করা।

(জ) সর্বদা মুরাক্বাবা করা। [ভীত অবস্থায় ধ্যানস্থ থাকা]

কৃচ্ছ্রসাধনার [রিয়াজত] অর্থ হলো ইচ্ছা ও প্রয়োজনীয়তার বিসর্জন।

খিলওয়াতের [নির্জনবাসের] শর্তাবলী

সুফিয়ায়ে কিরামের মতে খিলওয়াত চল্লিশ দিনের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। মানুষের সঙ্গ ছাড়া ও আল্লাহর সঙ্গ ধরা হলো সালিকের উদ্দেশ্য। এভাবেই কেটে যাবে সারা জীবন। চল্লিশ দিন একাধারে খিলওয়াত পালনের মধ্যে উপকার হলো, এর বদৌলতে আধ্যাত্মিক প্রকাশ উন্মোচণ হওয়া শুরু হয়। যদি সালিক তার বাকি সারা জীবন আল্লাহর আনুগত্যে কাটায় ও মানুষ থেকে দূরে থাকে, তাহলে আধ্যাত্মিক প্রকাশ হতেই থাকবে- আর এ থেকে উত্তম কোনো অনুগ্রহ নেই।

আল্লাহর অনুগ্রহ থেকে বঞ্চিত হলে কিছুদিনের জন্য খিলওয়াত পালন তার জন্য একান্ত আবশ্যক। অন্তত বছরে একবার তাকে চল্লিশ দিনের জন্য খিলওয়াতে বসতে হবে। ফলে তার নফসকে সে নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হবে এবং আল্লাহর ধ্যান-মুরাক্বাবা ও তিলাওয়াতুল কুরআনে অভ্যস্ত হতে পারবে।

খিলওয়াতের নিয়ম-কানুন সঠিকভাবে মানার মধ্যেই নিহিত এটা পালনের উপকার। যে কেউ খিলওয়াতের নিয়ত করবে প্রথমে তাকে জাগতিক ইচ্ছার সকল কলুষ থেকে মুক্ত হতে হবে। একই সময় তার সকল উপাসনাও হবে পরজগতের সকল উপকার লাভের ইচ্ছা থেকেও মুক্ত। [অর্থৎ, তার সব আমল হবে একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায়]

নিয়তের ওপর নির্ভর করে আমলের প্রতিদান। আমলের মধ্যে নিয়ত যতো উত্তম হবে এর প্রতিদানও হবে শ্রেয়। আল্লাহর নৈকট্য লাভ থেকে আরো ভালো কোনো কিছুই নেই। তাঁর থেকে দূরের যা কিছুই আছে তাকে বলে 'বিপর্যয়ের ধূম্রনীল' [হুদুস]। হৃদয়ের কলুষমুক্ততায়, কলুষযুক্ততার দিকে ঝুঁকে যাওয়া হচ্ছে কলুষতার নির্যাস। সেখানে নৈকট্য হচ্ছে বিশেষভাবে কলুষতাপূর্ণ। সুতরাং যে কেউ ইহ ও পরজগতে আল্লাহর বাইর-অনুগ্রহের আকাঙ্ক্ষী সে কলুষিত। অতএব, আল্লাহর ইবাদত ও নৈকট্য অর্জনের পূর্বপ্রস্তুতি হিসাবে এই কলুষতা থেকে পবিত্রতা অর্জন জরুরী। ইবাদত পালনে সালিকের সব নিয়ত থাকতে হবে একমাত্র আল্লাহর নৈকট্য লাভের আশা। মুক্ত থাকতে হবে সামাজিক উন্নত স্তর লাভের আশা, খ্যাতি, কারামত প্রকাশ, কুরআনের আয়াতের হাক্বিক্বাত লাভ ইত্যাদি থেকে।

কারো নিয়ত যদি হয় আল্লাহর নৈকট্যের বদলে খিলওয়াত দ্বারা সে কারামতওয়ালা হবে, তাহলে এ ইচ্ছা কোনো কোনো সময় পূর্ণও হতে পারে। কিন্তু বাস্তবে এটা হচ্ছে প্রতারণার নির্যাস, দূরত্বের কারণ, নির্বুদ্ধিতা ও অহঙ্কারের প্রকাশ!

সঠিক নিয়ত হলে অভ্যন্তর পবিত্রকরণে, হৃদয় পরিস্কারকরণে, নফসকে নিয়ন্ত্রণকরণে, মনকে দুঃশ্চিন্তামুক্তকরণে, খাবার স্বল্পকরণে এবং জিকরুল্লাহকে জারিকরণে উত্তম প্রভাব পড়বে। খিলওয়াতের মাধ্যমে সালিকের অভ্যন্তর ক্রমে উজ্জ্বল হয়ে ওঠবে। এবং বাহ্যিক কিছু অনার্জনীয় জ্ঞান আত্মপ্রকাশ করবে। হাক্বিক্বাতের চিন্তা তার মধ্যে উদ্ভুত হবে যার মাধ্যমে নফসে আন্দোলন শুরু হবে। সে বুঝতে পারবে, সালিকের জন্য কারামাত লাভের আশা খিলওয়াতের উদ্দেশ্যের সঙ্গে সাংঘর্ষিক ও অনেক দূরে। এ থেকে পাপিষ্ঠ শয়তান মনে করে তার মর্যাদা বৃদ্ধি হয়েছে! সে হয়ে ওঠে আরো অহঙ্কারী। সে তার ঘৃণ্য দৃষ্টি অপরদের ওপরও পতিত করে [আল্লাহ আমাদের রক্ষা করুন]।

এরূপ অধঃপতনের ফলাফল হেতু সে নিজেই নতুন শরীয়ত ও নবুওয়াতের দাবী করে বসতে পারে। আর এরই মাধ্যমে দূরে সরে পড়ে ইসলামের সঠিক রাস্তা থেকে- এমনকি বের হয়ে যায় ইসলাম থেকে [আল্লাহর নিকট আমরা আশ্রয় প্রার্থনা করি]।

অপরদিকে কারো নিয়ত সঠিক ও পবিত্র হলে, কারামতের প্রকাশ ঘটতে পারে। এটা তখন তার জন্য আল্লাহর ক্ষমতা ও মাহাত্ম্যের সুস্পষ্ট প্রমাণ হিসাবে প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠে। তার মধ্যে ঈমান-আমলের দৃঢ়তা, যথার্থতা ও হাক্বিক্বাত স্থায়িত্ব লাভ করে।

যদি খিলওয়াত [নির্জনবাস] পালনকারীর মধ্যে নিজের কোনো সম্পদের প্রতি আকর্ষণ বিদ্যমান থাকে, তবে তাকে অবশ্যই নিজেকে এ থেকে মুক্ত করতে হবে। যদি এই সম্পদের মালিকানা তার পরিবারের হয়ে থাকে, তাহলে নিজের মালিকানা বিসর্জন করে দিতে হবে। শুধুমাত্র খিলওয়াত পালনের স্থানে যেসব বস্তু নেওয়া তার জন্য জরুরী শুধু সেগুলোই নেবে- যেমন, জায়নামাজ ও পরিধেয় বস্ত্রাদি।

খিলওয়াতের স্থানের দরজায় উপস্থিত হয়ে সে দুআ করবে: "হে আল্লাহ! আমাকে সঠিকভাবে প্রবেশ হতে দিন এবং সঠিকভাবে বের করুন। আপনার অনুগ্রহে আমাকে সফলতা দান করুন।"

জায়নামাজে উঠার সময় প্রথমে ডান পা রেখে সে বলবে: "বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম। সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য। দরূদ ও সালাম আল্লাহর রাসূলের প্রতি। হে আল্লাহ! আমার গুনাহ-খাতা মাফ করে দিন, আপনার করুণার দরজা আমার জন্য খুলে দিন।"

এরপর খুব খুশু-খুজুর মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনায় দু’রাকাআত নফল নামায পড়বে। প্রথম রাকাআতের ফাতিহা ও সূরা পাঠ শেষে সে দু’আ করবে: “হে আমাদের প্রভু! আমরা তোমার উপর ভরসা করি, তোমার উপর আশ্রয় চাই, তুমিই একমাত্র আশ্রয়স্থল।” নামায শেষে সে কায়মনোবাক্যে জিন্দেগীর গুনাহ-খাতার জন্য অনুতপ্ত হবে ও তাওবা করবে আল্লাহর দরবারে। সে নিজের তনু-মন-প্রাণ সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণ করবে। সে কিবলামুখী হয়ে চোখ বন্ধ করে বসে যতক্ষণ সম্ভব তাশাহহুদ [কালিমা শাহাদাত] পাঠ করবে। এরপর আল্লাহ তা’আলাকে হাজির-নাজির হিসাবে ধ্যান করে গভীর মুরাক্বাবায় নিমগ্ন হবে। এভাবে সে ঐশী ছোঁয়া পেতে প্রস্তুতি গ্রহণ করবে। প্রস্তুত হবে মহাপ্রভুর অসীম বদান্যতার সায়রে নিমজ্জিত হতে।

নির্জনবাসের মধ্যে দৃঢ়তাকে পবিত্রকরণ, ধৈর্যধারণ এবং আল্লাহর সান্নিধ্য লাভের ইচ্ছার ওপর একনিষ্ঠতা অর্জনের পর সালিককে নিচের সাতটি শর্ত পালন করতে হবে।

১. সর্বদা অযু অবস্থায় থাকা: ক্লান্তভাব অনুভূত হলেই অযু করবে। অযুর মাধ্যমে তার অভ্যন্তরের বাইরদিকে বিস্তৃত পবিত্রতার আলো উজ্জ্বল হয়ে ওঠবে। অযু হলো হৃদয়ের ঔজ্জ্বল্যতার সহায়ক।

২. সর্বদা রোযা রাখা: উপবাস অবস্থায় সুন্নাতের আশীর্বাদের মধ্যে তার সময় অতিবাহিত হবে।

৩. অত্যল্প পানাহার: ইফতারের সময় তার খাবার হবে খুব অল্প। শুধু রুটি ও লবণ হলে আরো ভালো। সে যদি শুরু করে আস্ত রুটি দ্বারা তাহলে (চল্লিশ দিনের) শেষ দশ দিন সে গ্রহণ করবে অর্ধেক রুটি। সে যদি অর্ধেক রুটি দ্বারা শুরু করে তাহলে শেষে সে আহার করবে একচতুর্থাংশ রুটি।

খিলওয়াতের লোকজন তিন স্তরে বিভক্ত: ক. সবল, খ. মধ্যম ও গ. দুর্বল। দুর্বলরা তাদের রোযা প্রত্যহ ইফতারের মাধ্যমে ভাঙ্গে। মধ্যম ব্যক্তিরা প্রতি দু'দিন পরপর রোযা ভাঙ্গে এবং সবলরা প্রতি তিনদিন পরপর রোযা ভাঙ্গে। খিলওয়াত পালনকারী যে কোনো একটি দলের অনুসরণ করতে পারে। তবে শেষের স্তরের লোকজন সর্বোত্তম। কারণ এ থেকে তারা ক্ষমতা লাভ করে:

ক. গভীর অনুরক্তির ও খ. তাহাজ্জুদের নামায পালনের।

সকল কদর্যতা, অন্ধকারাচ্ছন্নতা ও অনিষ্টতার মূল হলো কাদামটি দ্বারা গঠিত অংশ। এগুলো নির্মূলে অল্প খাবার খুব উপকারী।

৪. অল্প নিদ্রা: যেটুকু সম্ভব সজাগ থাকতে হবে। যদি নিদ্রা এসে বেশি আচ্ছন্ন করে ফেলে তাহলে অযু করবে বা কুরআন তিলাওয়াত করবে। যদি নিদ্রা থেকে বেঁচে থাকা সম্ভব না হয়, তাহলে নিদ্রা ভেঙ্গে গেলেই অযু করে ইবাদতে লেগে যাবে।

শাহওয়াতের মরণ ও হৃদয়কে জীবিত রাখতে সর্বদা সজাগ থাকা খুব উপকারী। এতে দেহের রসবোধ হ্রাস পায়। ফলে পাপকার্য, অলসতা, গাফিলতি ইত্যাদি থেকে বাঁচা যায়।

৫. অল্প কথা বলা: মানুষের সঙ্গে বিনা কারণে কথা বলা থেকে নিজের জিহ্বাকে হেফাজতে রাখতে হবে। সুফিরা নীরবতা পালনে অভ্যস্ত আছেন। নীরবতা অনাকাঙ্ক্ষিত বিপদ থেকে রক্ষা করতে পারে। কথা সুন্দর কিংবা বিশ্রী হোক, এটা কখনো বিপর্যয়ের কারণ হওয়া থেকে মুক্ত নয়। সত্যিকার নিষ্কলুষ পবিত্রতার স্তরে পৌঁছুনোর পূর্ব পর্যন্ত সুন্দর কথাবার্তা নফসকে আনন্দ দান করে। এ থেকে উদ্ভূত হয় গরিমা এবং হাক্বিক্বাতের সম্মুখস্ত পর্দা গাঢ় হয়ে ওঠে। আর নিঃসন্দেহে,

খারাপ কথাবার্তার ফলাফল শাস্তি বৈ নয়। নীরবতা ছাড়া নিরাপত্তার রাস্তা কখনো নিরাপদ নয়।

হযরত মরিয়ম ও ঈসা আলাইহিসসালাম সম্পর্কে বর্ণিত আছে, আল্লাহ তা'আলা হযরত মরিয়মকে নীরবতা পালন করতে বললেন। এটা ছিলো হযরত ঈসা আলাইহিসসালামের মুখ থেকে কথা উচ্চারণের পূর্বশর্ত। ঈসা আলাইহিস সালামের আত্মা থেকে কথা বেরুলো আর মরিয়ম আলাইহাসসালামের নফস থেকে সৃষ্ট কথা বন্ধ হলো।

৬. চিন্তাকে নিয়ন্ত্রণে রাখা: মানব মন চিন্তার জঙ্গল। আজেবাজে চিন্তা থেকে মুক্ত থাকার উপায় হচ্ছে সর্বদা আল্লাহর জিকির-ফিকিরে নিমগ্ন থাকা। কিছু চিন্তা উত্তম হলেও, এ রাস্তার প্রাথমিক সালিকদের মধ্যে সে উত্তম চিন্তা কোনটি তা প্রকাশ পায় না। **হাদিসুন নাফস** এর অর্থ হলো: মানুষের নফস কথার রূহ এর সঙ্গে সংযুক্তি হেতু কথা বলার গুণাবলীর সঙ্গে সহজাত। এটা নিজের প্রেমাস্পদের সাথে বাক্যালাপের প্রত্যাশী সদা-সর্বদা। আর এই প্রেমাস্পদ হলো হৃদয়। যে মুহূর্তে নফস দেখতে পায় হৃদয় নিজের দিকে মনোযোগী হয়েছে ও তার কর্ণ অন্য কোনো শব্দ শুনা থেকে বিরত হয়ে গেছে, তখনই নফস হৃদয়ের সাথে বাক্যালাপে নিমগ্ন হয়। আর এভাবে অতীত ঘটনাবলীর কথা স্মরণ করাতে থাকে- যেমন: বিভিন্ন জনের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা, অন্যের কথা শ্রবণ, চোখে দেখা বিভিন্ন বস্তু, জিহ্বা দ্বারা স্বাদ গ্রহণ, ছোঁয়ার স্মৃতি এবং ভবিষ্যতের সুখবর প্রদান ইত্যাদি। একমাত্র তারই কথা শুনতে হৃদয়কে অভ্যস্ত রাখাও নফসের কাজ। ফলে সালিকের হৃদয় স্বীয় আত্মার কথা ও আল্লাহর কথা শ্রবণ থেকে গাফিল থাকে।

চিন্তাকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে খিলওয়াত পালনকারী যখন অধ্যবসায়ী হয় ও আল্লাহর তাওহীদের মধ্যে বিলীয় হয়ে যায়, তখন হাদিসুন নাফসের বিলুপ্তি ঘটে। নফস হয়ে যায় নীরব, হৃদয়ের কর্ণ নফসের কথা শ্রবণ থেকে হয় মুক্ত এবং প্রস্তুতি গ্রহণ করে নেয় ঐশী বাণী শুনতে।

৭. বিরতিহীন আমল: বাইর ও ভেতরের দিক থেকে সালিককে অবশ্যই উপাসনার বস্ত্রে আবৃত রাখতে হবে সর্বদা। প্রতিটি মুহূর্তে যে কাজটি সর্বাধিক উপকারী ও জরুরী, তাতেই তাকে নিমগ্ন থাকা চাই। সুতরাং যে 'প্রথম স্তরের' তাকে অবশ্যই ঐশী হিতোপদেশের সীমাবদ্ধতার মধ্যে থাকতে হবে। সময়মতো সুন্নাত মুতাবিক নামায পালন করতে হবে ও অন্যান্য সময় জিকির করে কাটাতে হবে। আর মাশাইখে আজম নির্দিষ্ট করেছেন যে, সকল জিকিরের সম্রাট হলো: **লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ।**

এটার মধ্যে আছে বিলুপ্তি (নফি) ও স্থিতি (ইসবাত)। এর কারণে জিহ্বা থেকে যখন এটা উচ্চারিত হয় তখন জাকির আল্লাহর সঙ্গে জীবন্ত হয়ে ওঠে। সৃষ্টি হয় হৃদয় ও জিহ্বার মধ্যে সঙ্গতি।

বিলুপ্তিকালে [**নফি- লা ইলাহা**] সে নিজেকে বিলুপ্ত বা ফানা করে দেয়। সবকিছু অস্তিত্বহীন হয়। আবার স্থিতিকালে [**ইসবাত- ইল্লাল্লাহ**] মহাবিশ্বের অস্তিত্ব ফিরে আসে [বাকা]। সবকিছু পুনরায় অস্তিত্বশীল হয়। এই কালিমা বার বার উচ্চারণের ফলে তাওহীদের স্বরূপ তার হৃদয়ে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সে বুঝতে পারে, তাওহীদের মূল হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত। এর শাখা-প্রশাখা রূহের মধ্যে বিস্তৃত।

এসময়, জিকির পরিণত হয় হৃদয়ের গুরুত্বপূর্ণ গুণে। অবসন্নতার সময় জিহ্বার জিকির স্থিত হওয়ার রাস্তা খুজে পায় না। তবে শেষ পর্যন্ত একটি স্থানে সে স্থির হয় যেখানে জিকির পরিণত হয় হৃদয়ের রত্নে। তখন জাকির রূপান্তরিত হয় জিকিরে, জিকির রূপান্ততি হয় হৃদয়ে এবং হৃদয় মাজকুরের [জিকিরের মূল স্বয়ং আল্লাহতে) মধ্যে বিলীন হয়।

এই স্তরে তাওহীদ বাক্যের আকার যদি হৃদয়ের বাইরের দিকে বিলীন হয়, তাহলে হৃদয়ের ভেতরের দিকের মুখে এর হাক্বিক্বাত একত্রিত হয়। এর মানা হলো হালের অবস্থা। জিকির, জাকির ও মাজকুর হয়ে যায় একাকার।

মধ্যম স্তরের সালিকের জন্য কিন্তু নিষ্ঠার সাথে কুরআন তিলাওয়াত ও শরীয়তের আদেশ-নিষেধের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকাই উত্তম। [উপরে বর্ণিত উচ্চ পর্যায়ের জিকির একমাত্র মুর্শিদের নির্দেশে করা যাবে] অবশ্যই জেনে রাখা দরকার, উচ্চপর্যায়ের জাকিরীনরাও প্রথমে কুরআন তিলাওয়াত, আল্লাহর গুণাবলীর মাহাত্ম্য অনুধাবন, আধ্যাত্মিক হাক্বিক্বাত অর্জন, মা'রিফাতের জ্ঞানার্জন, কুরআনের বিভিন্ন আয়াতের মর্মোদ্ধার ইত্যাদি থেকে প্রথমে উপকৃত হয়ে অগ্রসর হয়েছেন।

যার মধ্যে জিকিরের আলো তার স্বভাবজাত গুণে পরিণত হয়েছে, তার জন্য উত্তম কাজ হলো কুরআন তিলাওয়াত ও সঠিকভাবে নামায আদায় করা। কারণ এরূপ নামাযে থাকবে: জিকির, তিলাওয়াতুল কুরআন, খুশু (হাত-পায়ের মধ্যে বিনয়) ও খুজু (হৃদয়ের একাগ্রতা)।

যতক্ষণ পর্যন্ত নফস আনুগত্যের মধ্যে থাকবে ততক্ষণ এর মধ্যে স্থায়ী হবে হৃদয়ের সঙ্গে সামঞ্জস্যশীলতা। জায়নামাজে একত্রিত হবে রূহের নৈকট্যের সহযোগিতা, ঘোষণা, সমাজিক আনন্দবোধ ও বিভিন্ন ধরনের নামাযের প্রয়োজনীয়তা। এরই মধ্যে নিহিত সর্বোচ্চ নিরবচ্ছিন্নতা।

যদি লক্ষ্যণীয় হয় যে, নফসের মধ্যে কোনো ঘৃণ্য বিষয়ের উদ্ভব ঘটেছে, তাহলে উচিৎ হবে নফল নামায পরিত্যাগ করে কুরআন তিলাওয়াতে নিমগ্ন হওয়া। কারণ নফল নামায থেকে সুন্নাত তিলাওয়াত অনেকটা সহজ। আর তিলাওয়াত যদি ক্লান্তিকর মনে হয় তাহলে এটার বদলে জিকির করাই উত্তম। কারণ, নফসের জন্য পাতলা জিকির বার বার উচ্চারণ করা গভীর মর্মার্থযুক্ত তিলাওয়াতুল কুরআন থেকে অনেকটা সহজ। জিহ্বার জিকিরে অবসন্নতা আসলে, উচিৎ হবে ক্বালবী

জিকিরের দিকে মনোযোগ দেওয়া। একে মুরাক্বাবাও বলে। আর ক্বালবী জিকির বা মুরাক্বাবা হেতু যদি অবসন্নতা অনুভূত হয় তাহলে উচিৎ হবে বিশ্রাম নেওয়া বা নিদ্রামগ্ন হওয়া। এতে সব অবসন্নতা বিলুপ্ত হয়ে যাবে। এরপর পুনরায় নেক আমলের দিকে নিজেকে অগ্রসর করবে। অবশ্যই এটা উচিৎ নয় যে, কেউ ঘৃণা ও জবরদস্তিমূলকভাবে নিজের নফসকে কাজে নিমগ্ন করবে।

খিলওয়াত [নির্জনবাস] পালনকারীর জন্য উত্তম হলো উপরোক্ত উপদেশসমূহ ও আইন-কানুন পাঠ করে সঠিকভাবে অনুসরণ করা। এতে গোপন ঘটনাবলী তার নিকট উন্মোচন হবে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

খিলওয়াত পালনকারীর স্বপ্ন

খিলওয়াত পালনকারীর স্বপ্ন

খিলওয়াত পালনকারী যখন জিকিরের মধ্যে নিমগ্ন হয় তখন সময় সময় (এ জগতের) অনেক অনুভূতি অবচেতনের মধ্যে লুকিয়ে যায়। এরপর আবার তা ঘুমন্তাবস্থায় স্বপ্নের মতো স্মৃতিপটে ভেসে আসে। সুফিরা একে 'ওয়াকি'আ' বলেন। শব্দটির অর্থ স্বপ্ন। কোনো কোনো সময় এসব সত্যস্বপ্ন জাগ্রত অবস্থায়ও অবচেতন থেকে মুছে না যেয়েও চেতনার মধ্যে আত্মপ্রকাশ করে থাকে।

অধিকাংশ ক্ষেত্রে ওয়াকি'আ হয় ঘুমের মধ্যে। আর ঘুমের মধ্যে দেখা স্বপ্নের কোনোটা সত্য এবং কেনোটা মিথ্যা। অধিকাংশ ঘুমের স্বপ্নে নফস রূহের অংশীদার হয়ে থাকে। সত্য হলো রূহের গুণাবলীর অন্তর্ভূক্ত। অন্যদিকে মিথ্যা হলো নফসের গুণাবলীর অন্তর্ভূক্ত। মুকাশাফা কখনো মিথ্যা হয় না। এটা রূহের এককত্বের প্রতীক যা দৈহিক সকল অন্ধকারাচ্ছন্ন চিন্তা থেকে মুক্ত।

ওয়াকি'আ ও মান'আম তিন অংশে বিভক্ত:

১. মুক্ত প্রকাশ (কাশফ)

মুক্ত রূহের চোখে কেউ ধ্যানের মাধ্যমে ঘুমন্ত (খোয়াব) কিংবা ওয়াকি'আর মধ্যে থেকে বিভিন্ন অবস্থার অবলোকন করে যা তখনো গোপন আছে। এরপর সে দেখার পরও এই অবস্থাটি বাস্তব জগতে ঘটে যায়। কিন্তু দর্শকদের নিকট বাহ্যিকভাবে গোপন থাকার ফলে, এটা হঠাৎ প্রকাশের মতোই দৃশ্যমান হয়।

যদি খোয়াব [ঘুমন্ত] অবস্থায় কেউ দেখে নেয় যে, কোনো বিশেষ স্থানে গুপ্তধন লুকানো আছে আর এরপর সে অনুসন্ধান করে এটা পেয়ে যায়- তাহলে বুঝতে হবে, এটা হলো '**কাশফে মুজাররাদ**' [বিশুদ্ধ কাশফ]।
উক্ত কাশফের অর্থ দু'ভাবে বুঝা যায়:

(ক) প্রকাশের মাধ্যমে: এটা হলো 'আত্মার স্বপ্ন'।

(খ) অদৃশ্য বার্তবাহকের মাধ্যমে: এটা হলো 'আত্মার কর্ণ'।

বাগদাদে এক দরবেশ বাস করতেন। তিনি আল্লাহর উপর পূর্ণ ভরসার রাস্তায় অবিচল ছিলেন। কোনো ব্যাপারেই তিনি প্রশ্ন করতেন না। কিন্তু একদিন এমন ভীষণ অভাবের মধ্যে পড়লেন যে, মন বললো ভিক্ষা করবেন। সাথে সাথেই তিনি অনুতপ্ত হয়ে বললেন, 'হায়! এতো কাল যাবৎ আল্লাহর উপর ভরসা করে কাটালাম। এখন কিভাবে এ থেকে দূরে সরে যাবো?'

সে রাত তিনি স্বপ্নে দেখলেন, এক অদৃশ্য ব্যক্তি তাকে ডেকে বলছেন: ''ওহে! ঐ বিশেষ স্থানে যাও। সেখানে দেখতে পাবে নীল রঙের একটি খিরক্কা। এর ভেতর কিছু স্বর্ণের টুকরো পাবে। এগুলো দিয়ে তোমার প্রয়োজন পূরণ করো।''

ঘুম থেকে জেগে ওঠে তিনি ঐ স্থানে যেয়ে ঠিকই নীল খিরক্কা ও স্বর্ণের টুকরোগুলো পেলেন।

উপরোক্ত ধরনের খোয়াবকে সুফিরা '**সত্য রুইয়া**' বলেন। এ ধরনের স্বপ্ন হচ্ছে নবুওয়াতের অংশ। নবুওয়াতের পূর্ব থেকেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনুরূপ সত্য-স্বপ্ন দেখতেন। এরূপ সত্য-স্বপ্নের মধ্যে মিথ্যার কিছু নেই। নবী-রাসূলদের হাদিস থেকে প্রমাণিত হওয়ার পর কোনো জ্ঞানী ব্যক্তি মাত্রই এটা মেনে নেবেন।

(স্বপ্নের মধ্যে বা অন্যভাবে) দেহ থেকে রূহ যখন আলাদা হয়ে যায়, তখন তার দেখা ও শুনা ইহজগতের ছোটখাটো বিষয়ও সে জানে। তবে অভ্যন্তরীণ ও বাইরের দিক থেকে তার জ্ঞান কিন্তু এরই মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এটা আরো ব্যাপক। দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় তার বাইর ইন্দ্রিয় দ্বারা সে বস্তুজগতের আকার আয়তন সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করে। অপরদিকে তার অন্তর্দৃষ্টির ক্ষমতাবলে সে তার চোখ ও কান দ্বারা যথাক্রমে দেখে ও শুনে।

২. বিভিন্ন ধরনের খোয়াব ও ওয়াকি'আ থেকে কল্পনাপ্রসূত কাশফ

খোয়াব কিংবা ওয়াকি'আয় আত্মা কিছু গোপন জিনিষ দেখতে পায়। এ অবস্থায় আত্মার সঙ্গে যুক্ত থাকায় নফসও অংশীদার হয়। কল্পনা শক্তির মাধ্যমে নফস্ আত্মার ওপর যথোপযুক্ত আকারের আবরণ সৃষ্টি করে এবং এটাই দেখা যায়। ওয়াকি'আ অবস্থায় চিন্তিত মুরীদ দেখতে পায়, সে সিংহ ও হিংস্র জন্তুর সাথে লড়াই করছে। লড়াই করছে সর্প, বিচ্ছু ও কাফিরদের সাথে। সত্যিকার মুর্শিদ দেখতে পান যে, মুরীদ তার নফসের সঙ্গে দ্বন্দ্বে আছে। এই দ্বন্দ্ব হয়:

১. বন্য জন্তুর সঙ্গে, হিংস্রতার আকারে।

২. সর্প ও বিচ্ছুর সঙ্গে, শত্রুতার আকারে।

৩. কুফরের সঙ্গে, [আল্লাহর প্রতি] অবাধ্যতা ও দূরত্বের আকারে।

সালিক যদি দেখে, সে মরুভূমি, বিরানভূমি, নদীনালা, সাগর-জলাশয় ইত্যাদি পাড়ি দিচ্ছে কিংবা আকাশে উড়োউড়ি করছে বা অগ্নিকুণ্ডের ওপর দিয়ে চলে যাচ্ছে, তাহলে শায়খ জানেন, তার মুরীদ লোভ-লালসার বিভিন্ন স্তর পাড়ি দিচ্ছে। তিনি তাকে চারটি মৌলিক উপদানের মধ্যে দেখতে পান। এগুলো হলো, মাটি, বাতাস, পানি ও আগুন।

এ চারটি মৌলিক উপাদানের দোষগুণ থেকেই উপরোক্ত বিভিন্ন অবস্থা স্বপ্নের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়।

মাটির দোষগুণ হলো: কৃপণতা, অলসতা, অজ্ঞতা, ন্যায়বিরুদ্ধতা, অন্ধকাচ্ছন্নতা ও কদর্যতা।

পানির দোষগুণ হলো: দ্রুততা, বিস্মরণশীলতা, অসৎ লোভ-লিপ্সার সঙ্গে একাত্ম, নিদ্রামগ্নতা, সামাজিক প্রভাব পরিবর্তনকে গ্রহণ করা।

বাতাসের দোষগুণ হলো: লোভ-লালসার দিকে ঝুকে পড়া, অবস্থা থেকে অবস্থায় পরিবর্তনে তাড়াহুড়ো, ভীষণ কষ্টবোধ।

আগুনের দোষগুণ হলো: রাগ, সামাজিক খ্যাতির লিপ্সা, গরিমা, পরমানন্দবোধ।

নফস শেষোক্ত মানসিক অবস্থাসমূহ সবশেষে পাড়ি দিয়ে থাকে।

খিলাওয়াত পালনকারীর নিকট যদি [আল্লাহ তা’আলার] ইচ্ছা হয় তাহলে সে দেখবে:

ক. আত্মার হাক্বিক্বাত সূর্যের আকারে।

খ. হৃদয়ের হাক্বিক্বাত চন্দ্রের আকারে।

গ. অন্তরের গুণাবলী নক্ষত্রপুঞ্জের আকারে।

যতো সত্যই সে অবলোক করুক না কোনো, সবই দৃশ্যমান হয় যথযথ কল্পনাপ্রসূত আকর্ষণীয় আবরণে। এ কারণেই একে ‘**কাশফে মুখাইয়্যাল**’ [খিয়ালী কাশফ] বলে। সুতরাং এতে সত্যমিথ্যার মিশ্রণ থাকার সম্ভাবনা আছে- অর্থাৎ পুরোটা মিথ্যা নয়। কারণ, এ ধরণের স্বপ্ন আত্মর জন্য অনুধাবনযোগ্য হয়ে থাকে।

রূহ কর্তৃক উপলব্ধি অবস্থায় যদি, ভোগবিলাসী কল্পনা রুহানী বুঝের সাথে জড়িত না হয় এবং কল্পিত শক্তির সৃষ্ট বস্ত্র দ্বারা রূহ আবৃত না হয় তাহলে, বুঝতে হবে এই ওয়াকি'আ কিংবা খোয়াব সম্পূর্ণ সত্য। অন্যথায় [এসব ব্যাপার সম্পৃক্ত থাকলে] বুঝতে হবে এতে মিশ্রিত আছে সত্য ও মিথ্যা।

স্বপ্নের তাবিরদাতা আত্মার সত্যতা ও কল্পনাসৃষ্ট উপদানকে আলাদা করে তাবির দিয়ে থাকেন।

৩. বিশুদ্ধ কল্পনা- যেখানে ইন্দ্রিয়লব্ধ চিন্তা-ভাবনা হৃদয়ের ওপর প্রধান্য দেয়। এর ফলে গোপন জগৎ থেকে রূহ হয়ে পড়ে পর্দাবৃত।

ঘুমন্ত ও ওয়াকি'আ অবস্থায় উপরোক্ত চিন্তা-ভাবনা অধিক শক্তিশালী হয়ে ওঠে। প্রত্যেক কল্পনাপ্রসূত ভাবনা আকর্ষণীয় বস্ত্র দ্বারা আবৃত হয়। এসব আকার কল্পনা শক্তির মাধ্যমে চোখের মধ্যে দৃশ্যমান হয়। এর প্রতারণা হয়ে ওঠে পরিস্কার।

সুতরাং, কেউ যদি কখনও গোপন ধন লাভের চিন্তা করে ও খোয়াবে দেখে সে তা পেয়ে গেছে কিংবা নীতিবিরুদ্ধ কেউ দাবী করলো মানুষ তাকে [পীর হিসাবে] গ্রহণ করে নিয়েছে এবং এর সত্যতা সে স্বপ্নযোগে দেখেছে, তাহলে মুর্শিদ জানেন- এরূপ প্রকাশ মূলত লোভ-লালসা থেকে সৃষ্ট। এটা লিপ্সাকারী মুরীদের মাঝে প্রতারণা হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছে।
মুর্শিদ একে নিষ্ফল বাসনা বলবেন কিংবা:

(ক) খোয়াব হলে, আজগাসে আহলাম [বিশৃঙ্খল ব্যাখ্যাবহির্ভূত স্বপ্ন] বলবেন।
(খ) ওয়াকি'আ হলে, মিথ্যা স্বপ্ন বলবেন।

উপরোক্ত ধরনের স্বপ্ন ও খোয়াবে আসল সত্য কখনও উন্মুক্ত হয় না। এর কারণ হলো, সন্দেহযুক্ত নফস রূহের সাথে অংশীদারিত্বের যোগ্যতা লাভ করে না। সত্য নফস থেকে অনেক দূরে।

অপরদিকে সত্যিকার ওয়াকি'আর [স্বপ্নের] শর্ত হলো:

১. জিকিরের মধ্যে ডুবন্ত থাকা এবং যাকিছু অনুভব হয় তা থেকে দূরে থাকা।

২. আন্তরিকতার উপস্থিতি ও অপরদের দ্বারা দৃশ্যমান হওয়ার ইচ্ছা থেকে মুক্ত থাকা।

আন্তরিক ব্যক্তির ক্ষেত্রেও মুক্ত অলীক কল্পনা পরিণত হতে পারে 'অলীক কল্পনাপ্রসূত কাশফ' -এ। আর একই সময় জিকরুল্লাহর মধ্যে ডুবন্ত থাকার কারণে, কাশফের রূহ পরিবর্তিত হয়ে নফসের অলীক কল্পনায় পরিণত হতে পারে। এটা তখন সত্যিকার ওয়াকি'আ হবে ও এর ব্যাখ্যাও সম্ভব হয়ে ওঠবে।

সকল অবস্থায় ঘুমের মধ্যে ওয়াকি'আ একই ধরনের, যদি না এটা প্রমাণিত হয় যে, খিয়ালী মুজাররদ [কাল্পনিক] ছিলো। ওয়াকি'আর মধ্যে খিয়ালী মুজাররদ আছে কি না প্রমাণ করা যেতে পারে।

এটা সহজবোধ্য যে, ওয়াকি'আ এবং মানআ'মে [নিদ্রায়] সত্য কিংবা মিথ্যা উভয়টি প্রকাশ পেতে পারে। অন্য প্রকাশে সত্য হওয়া অসম্ভব, কারণ একমাত্র কাশফে মুজাররদ ছাড়া সত্য প্রকাশ হয় না।

মুক্ত প্রকাশ হয়:

(১) মুকাশাফার [জাগ্রতাবস্থার] মধ্যে।

(২) খোয়াব বা ওয়াকি'আয় [অনুভূত বস্তুসমূহ গোপন থাকাবস্থায়]।

মুকাশাফা অবস্থায় রূহের বুঝ যুক্ত আছে যাকিছু :

(ক) হয় গোপন জগতে আছে।

(খ) না হয় বস্তু জগতে আছে।

প্রথমোক্ত ক্ষেত্রে, বস্তু জগতে এর আত্মপ্রকাশ অসম্ভব। যেমন: বেহেশত, দোযখ, লাওহে মাহফুজ, আরশে আজিম, কুরসি ও কলম। আর বস্তুজগতে এর আত্মপ্রকাশ সম্ভব। যেমন: সম্ভাব্য ঘটনাবলী, অর্জনের জরুরত, ওসব আকার যা গোপন জগতে প্রকাশিত হয় নি। বস্তু জগতে আত্মপ্রকাশ দৈবায়ত্ব আকার হিসাবেও হতে পারে। যেমন: ফিরিশতা এবং দেহ থেকে মুক্ত রূহ।

হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়সাল্লামের নিকট জিব্রাইল আলাইহিসসালাম মানুষের রূপে আসতেন। কখনও ঐশী প্রেরণা ও কখনও মরুভূমির অধিবাসী হিসাবে। হযরত উমর রাদ্বিআল্লাহু বর্ণিত হাদিস থেকে বিষয়টি জানা যায়। একদা খুব কালো চুলবিশিষ্ট ও সাদা জামা পরিধান করে একজন আগন্তুক মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সালাম জানিয়ে হাঁটুর মধ্যে হাঁটু লাগিয়ে বসলেন। তিনি ইসলাম, ঈমান ও ইহসান সম্পর্কে কয়েকটি প্রশ্ন করলেন ও জবাব শুনলেন। এরপর তিনি প্রস্থান করেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপস্থিত সাহাবায়ে কিরামদেরকে জিজ্ঞেস করলেন: 'তোমরা এই প্রশ্নকারীকে চিনতে পেরেছো?' তাঁরা জবাব দিলেন, 'একমাত্র আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই অবগত।' তিনি বললেন: 'তিনি ছিলেন জিব্রাইল [আ.]। তোমাদেরকে দ্বীন শিক্ষা দিতে এসেছিলেন।'

উক্ত হাদীস থেকে স্পষ্ট, হযরত উমর ও অন্যান্য উপস্থিত সাহাবায়ে কিরাম জিব্রাইল আলাইহিসসালামকে মানুষের আকৃতিতে স্বচক্ষে দেখেছিলেন। এটাও স্পষ্ট যে, ফিরিশতার আকার কাল্পনিক ছিলো না। যদি তা-ই হতো তাহলে যারতার মুক্ত রূহানীর কল্পনা মুতাবিক বিভিন্ন আকারে দেখতেন। যাদের রূহ দেহের সঙ্গে যুক্ত আছে তাদের কল্পনা ও যাদের রূহ দেহ থেকে মুক্ত আছে তাদের কল্পনার মধ্যে পার্থক্য বিদ্যমান। মুক্ত রূহের নিকট ফিরিশতার সাদৃশ্য মানুষের মতো হওয়াটা হচ্ছে দৈবায়ত্ব আকার। তাঁদের স্বাভাবিক [আধ্যাত্মিক] আকার একমাত্র গোপন [আধ্যাত্মিক] জগৎ ছাড়া বস্তু জগতে আত্মপ্রকাশ সম্ভব নয়।

ফিরিশতারা যে রূপেই ইচ্ছা করেন, সে রূপে দৃশ্যমান হওয়ার ক্ষমতা রাখেন। উপরে উদ্ধৃত হাদিস দ্বারা এবং বিভিন্ন মাশাইখে আজমের উক্তি থেকে এ কথাটি প্রমাণিত।

উপরে গোপন জগতের ব্যাপার যখন বস্তু জগতের মধ্যে বস্তু হিসেবেই আত্মপ্রকাশ করে তা, রূহ কর্তৃক দেখা ও বুঝার ব্যাপারে আলোচনা হয়েছে। তবে বস্তু জগতের ব্যাপারও রূহের মাধ্য দেখা ও বুঝা সম্ভব। যেমন নিচের উদাহরণগুলো:

(ক) মিরাজের রাতে হযরত রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জেরুজালেমের মসজিদে আকসা দেখেছিলেন। কাফিররা হুজুরের এ বক্তব্য মেনে নিতে পারলো না। তারা প্রশ্ন করলো, আপনি যদি সত্যবাদী হয়ে থাকেন তাহলে বলুন, ঐ দূরবর্তী মসজিদে কয়টি পিলার ও কয়টি জানালা আছে? হালের অবস্থায় তিনি মসজিদের একটি চিত্র দেখলেন ও গুণে গুণে সব প্রশ্নের জবাব দিলেন।

(খ) তারা তাঁকে প্রশ্ন করলো, শামের নিকটস্থ কাফিলা সম্পর্কে সংবাদ দিতে। হযরতের সম্মুখস্ত পর্দা উন্মোচন হলো। তিনি দেখলেন কাফিলা মক্কা শরীফ থেকে এক দিনের দূরত্বে অবস্থান করছে। তিনি বললেন, আগামীকাল ভোরে কাফিলা পৌঁছুবে। ঠিক তা-ই হলো।

(গ) একদা খলিফা উমর ইবনে খাত্তাব রাদ্বিআল্লাহু আনহু মসজিদে নববীর মিম্বরে দাঁড়িয়ে খুৎবা দিচ্ছিলেন। এ সময় সেনাপতি সারিয়ার নেতৃত্বে নিহাগড় নামক স্থানে একটি জিহাদ চলছিলো। হঠাৎ হযরত উমর রাদ্বিআল্লাহু আনহু খুৎবা থামিয়ে মুকাশাফার মধ্যে ধ্যানস্থ হয়ে দেখলেন, শত্রুরা পেছন থেকে মুজাহিদদের ওপর অতর্কিতে হামলা চালাচ্ছে। তিনি সজোরে বললেন: 'হে সারিয়া! পাহাড়ের দিকে [যাও], পাহাড়ের দিকে!' মসজিদে উপস্থিত সবাই এ কথাগুলো শুনলেন।

ওদিকে সুদূর নিহাগড়ে সেনাপতি সারিয়া এই কথাগুলো শুনে সাথে সাথে সেনাবাহিনীকে পাহাড়ের দিকে নিয়ে গেলেন ও যুদ্ধ করে জয়লাভ করলেন।

গ্রন্থকার শায়খুল ইসলাম হযরত শাহাবুদ্দিন উমর সুহরাওয়ার্দি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি অনুরূপ অনেক ঘটনা বর্ণনা করেছেন।

খিলওয়াতকারী সত্যিকার মুরীদ কখনও এরূপ কাশফ বা কারামতের প্রত্যাশী নয়। এগুলো অর্জনে তাদের আত্মা লালায়িত নয়।

শরীয়তের মহাসড়কে নয়- এমন একটি দল হচ্ছে খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বী রাহাবীন [সন্ন্যাসী]। তাদের জন্য উক্তরূপ কাশফ ও কারামত রহিত হয় নি। তবে তাদের ক্ষেত্রে এগুলোর প্রকাশ হয় প্রতারণা হিসাবে। কারণ এগুলোর ওয়াজদ এর মাঝে রাহাবীনরা প্রত্যহ প্রতারিত হয়ে সঠিক হিদাআতের রাস্তা থেকে দূর থেকে দূরে সরে যায়।

অপরদিকে হাক্ক ও সত্যপথে অধিষ্ঠিত নিষ্ঠাবান লোকদের ক্ষেত্রে কাশফ হচ্ছে আল্লাহ প্রদত্ত কারামত। সুতরাং এর দ্বারা ব্যক্তির ঈমানের দৃঢ়তা ও আনুগত্যতা আরো মজবুদ হয়।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

ইলম [উচ্চতর জ্ঞান]

ইলম হচ্ছে একটি আলোকরশ্মি। ঈমানদার বান্দার হৃদয়ে প্রজ্জ্বলিত নবুওয়াতের মোমবাতি এর সূত্র। এই ইলম দ্বারা সে খুঁজে পায়:

১. আল্লাহপ্রাপ্তির রাস্তা।

২. আল্লাহর কর্মের রাস্তা।

৩. আল্লাহর নির্দেশাবলীর রাস্তা।

ইলম হচ্ছে মানবের বিশেষ গুণ। ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে জানা ও আক্বল বা যুক্তি থেকে এটি আলাদা। আক্বল একটি প্রাকৃতিক আলো। এর দ্বারা ভালো ও মন্দের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় সম্ভব। আক্বলের বৈশিষ্ট হলো:

(ক) এ জগতে আক্বল [বুদ্ধি] ঈমানদার ও কাফির উভয়ের মধ্যে বিদ্যমান।

(খ) পরজগতে আক্বল একমাত্র ঈমানদারদের জন্য খাস।

ইলম শুধুমাত্র ঈমানদারদের সম্পদ। তবে ইলম ও আক্বল একে অন্যের জন্য জরুরী। [পরজনমের] আক্বলের চোখ উজ্জ্বল হয় হিদায়াতের আলো দ্বারা। শরীয়তের সুরমা দ্বারা তার দেহ হয় আবৃত। ইলমের নির্যাস একটি। কিন্তু এর আকার দু'টি:

১. সৃষ্টিকর্তা সম্পর্কিত ইলম। এতে আছে হিদাআতের আক্বল - যা একমাত্র ঈমানদারদের জন্য খাস।

২. সৃষ্টজগৎ সম্পর্কিত ইলম। এতে আছে জীবন-জীবিকার আক্বল। [এটা সবার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য]

বিশ্বাসী, আল্লাহ অন্বেষী ও আখিরাতের মুক্তিকামী মানুষের জন্য জীবন-জীবিকার আক্বল হচ্ছে '**হিদাআতের আক্বল**' [শরীয়ত] এর ওপর আনুগত্যতা। উভয়টির মধ্যে মতৈক্য সৃষ্টি হলেই সত্যিকার '**জীবন-জীবিকার আক্বল**' সার্থক হবে। আর '**জরুরতের আইন**' মুতাবিক, উভয়টির মধ্যে মতানৈক্য সৃষ্টি যখনই হবে, তখনই [উভয়টি] মূল্যহীনে পরিণত হবে। আর এর ওপর মনোযোগেরও কোনো প্রয়োজন নেই।

সুতরাং আল্লাহ অন্বেষীদেরকে জগতের মানুষ দুর্বল আক্বলের অধিকারী বলে। তারা জানে না, তার মধ্যে সাধারণ আক্বল ছাড়াও আরেকটি আক্বল বিদ্যমান।

ইলম তিন ধরনের:

১. ইলমে তাওহীদ - আল্লাহর একত্বের জ্ঞান।

২. ইলমে মা'রিফাত - আল্লাহর কর্ম সম্পর্কে জ্ঞান। এতে আছে: ফানা, সৃষ্টি, আল্লাহর নৈকট্য, আল্লাহ থেকে দূরত্ব, জীবন্তকরণ, মৃতকরণ, বিচ্ছুরণ, একত্রীকরণ, প্রতিদান, শাস্তি এবং অন্যান্য বিষয়।

৩. ইলমে শরীয়ত- শরীয়তের হালাল-হারাম সম্পর্কিত জ্ঞান।

উক্ত তিনটি ইলমের রাস্তার ওপর ভিন্ন যাত্রী আছেন। এরা হলেন:

ক. প্রথম রাস্তার যাত্রী যারা হচ্ছেন 'আল্লাহ সম্পর্কে জ্ঞানী'। তাঁদের ইলমে যুক্ত আছে বিরোধীতাহীন অন্য দু'টি ইলম।

খ. দ্বিতীয় রাস্তার যাত্রী যারা হচ্ছেন 'পরজগতের জ্ঞানী'। তাঁদের ইলমে যুক্ত আছে বিরোধিতাহীন শরীয়তের জ্ঞান।

গ. তৃতীয় রাস্তার যাত্রী যারা হচ্ছেন 'এ জগতের জ্ঞানী'। তাঁরা অপর দু'টি ইলম সম্পর্কে অজ্ঞাত। যদি থাকতো তাহলে তিনি এর সদ্ব্যবহার করতেন। কারণ ভালো কাজের হ্রাস মানে ঈমানের খতরা। তার অন্তর যদি আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত থাকতো এবং পরকালের প্রতি বিশ্বাস থাকতো তাহলে তিনি কখনও ভালো কাজ ছেড়ে মন্দের দিকে পা বাড়াতেন না।

আল্লাহ সম্পর্কে জ্ঞানীরা যুক্তি ও দৃঢ় প্রত্যয়সহ আল্লাহর একত্বের ওপর বিশ্বাসী, পরকালের প্রতি বিশ্বাসী ও বিশ্বাসী আল্লাহর কর্মের প্রতি।

ইসলামের নির্দেশনার প্রতি আনুগত্যশীলরা হলেন: প্রথম দল (আল্লাহর নৌকট্য লাভকারীরা) ও সুফিয়ে কিরাম।

পরজগত সম্পর্কে জ্ঞানীরা শুধু পরকালের ওপর দৃঢ়বিশ্বাসী নন, তাঁরা ইসলামের অভ্যন্তরীণ জ্ঞানেও জ্ঞানবান এবং সে মুতাবিক আমল করেন। তাঁরা হচ্ছেন:

(ক) আবরার (সাধু)

(খ) ডানহাতের দলভুক্ত।

এ জগত সম্পর্কে জ্ঞানীরা ইসলামের বাইর দিকের জ্ঞান শিক্ষার মাধ্যমে অর্জন করেছেন। কিন্তু যা তারা শিখেছেন তা কাজে লাগাচ্ছেন না। ঈমানের খতরা হেতু তারা সঠিক আমলী জিন্দেগী অতিক্রম করবেন কি না সন্দেহ আছে। তারা ঘৃণ্য ও নিষিদ্ধ কর্মে জড়িয়ে পড়তে পারেন সহজে। এরা হচ্ছেন:

(ক) বামহাতের দলভুক্ত।

(খ) মন্দ স্বভাবের লোক।

(গ) জ্ঞানপাপী। এদের উপর অবতরণ হয় আল্লাহর তীব্র ক্রোধ।

মিরাজের রাতের বর্ণনায়, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “আমি একদল লোক দেখতে পেলাম যাদের জিহ্বা অগ্নির তৈরি কাঁচি দ্বারা কাটা হয়েছে। জিজ্ঞেস করলাম, তোমরা কারা? তারা জবাব দিল, আমাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিলো ভালো আমলের জন্য। কিন্তু আমরা এর বদলে খারাপ আমলে জড়িয়ে পড়েছিলাম।”

আল্লাহ সম্পর্কে জ্ঞানীদের থেকে উত্তম আর কেউ নেই। আর শুধু এজগৎ সম্পর্কে জ্ঞানীদের চেয়ে নিকৃষ্ট কেউ নেই। [হাদিস]

যে ইলম সন্ধান করা হয় আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য, এরচেয়ে লাভজনক আর কিছু নেই। যে ইলম সন্ধান করা হয় শুধুমাত্র জাগতিক উপকার লাভের জন্য, এরচেয়ে

ক্ষতিকর আর কিছু নেই। ইলম হলো স্বাস্থ্যের জন্য জরুরী উপাদানের মতো। যার দেহের বিভিন্ন অংশ রসহীন, মেজাজী, পুষ্টিহীন, রোগাক্রান্ত তার জন্য ইলম একটি মহৌষধ। যে অনুসন্ধানীর মধ্যে আকাঙ্ক্ষায় ঘাটতি নেই, না আছে ইহলৌকিক ভালোবাসা, না সে আল্লাহবিমুখ, তার নফসের জন্য ইলম হচ্ছে উপকারী খাদ্য। হৃদয় ও নফসের প্রসারণের কারণ।

হৃদয় যখন ইহলৌকিক প্রেমে আসক্ত হয় এবং অস্তিত্বের বিভিন্ন অংশ ভরে ওঠে নিকৃষ্ট রসে তখন, ইলম তার জন্য হয়ে ওঠে অতি আকাঙ্ক্ষা, গরিমা, অহঙ্কার, ঘৃণা ইত্যাদির কারণ। এরূপ বিরাট প্রতারণাকে নির্মূলের জন্য জরুরী হচ্ছে:

(ক) ইলমকে একমাত্র পাপমুক্তির দিকনির্দেশা হিসাবে অর্জন করা।

(খ) অতি আকাঙ্ক্ষায় আবদ্ধ অবস্থা থেকে ইলমকে মুক্তির কারণ হিসাবে বেছে নেওয়া।

নফসের উপকারী ইলম দ্বারা ধর্মানুরাগ ও দীনতা বৃদ্ধি হয়। জ্বলে ওঠে খোদান্বেষা ও আল্লাহপ্রেমের অগ্নি। এটা হচ্ছে প্রাণের সহায়। হৃদয় থেকে এর [উপকারী ইলমের] বিচ্ছিন্নতা মানে হৃদয়ের মৃত্যু। এরূপ বাণী এসেছে আমিরুল মু'মিনীন হযরত আলী ইবনে আবি তালিব রাদ্বিআল্লাহু আনহু এবং হযরত ফতেহ মুসলী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি থেকে।

অপরদিকে নফসের জন্য অনিষ্টকর ইলম বৃদ্ধি করে গৌরব, অহঙ্কার, ধৃষ্টতা, জাগতিক আকর্ষণ।

ইলমের সুফল সে-ই লাভ করে যে তার সিদ্ধান্তে অটল আছে। ঠিক এ কথাই বলেছেন হযরত আবু ইয়াজিদ বিস্তামী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। মানুষের মধ্যে আল্লাহর ওলি থাকা হচ্ছে তাঁর পক্ষ থেকে বিরাট নিয়ামত। আর ওলি না থাকার অর্থ হলো তাঁর নিয়ামত থেকে বঞ্চিত হওয়া। আর এটাই হচ্ছে কুফর ও অন্ধকারাচ্ছন্নতার সূত্র।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

মা'রিফাত [গভীর জ্ঞান]

মা'রিফাত হচ্ছে সংক্ষেপিত উলূম [জ্ঞানসমূহ] এর সম্প্রসারণ। যেমন:

১. ইলমে নাহু: এটা হচ্ছে কিভাবে প্রত্যেক (শব্দ বা অর্থ এর) ঘটক ক্রিয়া করে তা জানা।

২. মা'রিফাতে নাহু: এটা হচ্ছে পাঠের সময় প্রত্যেক [স্বয়ং] ঘটক সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরিচিত হওয়া। এতে না আছে কালের ক্ষয় কিংবা বিবেচনা, না আছে তার অবস্থান সম্পর্কে চিন্তা।

৩. তা'রিফে নাহু: এটা হচ্ছে ঘটককে চিন্তা দ্বারা জানা-চেনা। [ইলমে নাহু সত্ত্বেও] এ ব্যাপারে অসতর্কতা হলো মারাত্মক ভ্রম।

মা'রিফাতুল্লাহ নফসের মা'রিফাতের মধ্যে সীমাবদ্ধ। আল্লাহর মা'রিফাতের নিদর্শন হলো: আল্লাহর গুণাবলী সম্পর্কে বিভিন্ন অবস্থার যেমন, দুর্ঘটনা এবং বিপর্যয়-পরিপ্রেক্ষিতে অবগত হওয়া। এরই মাধ্যমে এটাও জানা যে, একমাত্র তিনিই সবকিছুর মূল ও অবিমিশ্র স্রষ্টা।

ইলমে তাওহীদে জ্ঞানবান ব্যক্তি দেখতে পান:

ক্ষতির কারণ হচ্ছেন আল্লাহ, লাভের কারণ হচ্ছেন আল্লাহ, নিষিদ্ধকরণের কারণ হচ্ছেন আল্লাহ, প্রতিদানের কারণ হচ্ছেন আল্লাহ, সংক্ষীর্ণকরণের কারণ হচ্ছেন আল্লাহ, প্রশস্তকরণের কারণ হচ্ছেন আল্লাহ।

তিনি এসব ব্যাপার খুব তাড়াতাড়ি অনুধাবন করেন। এ ব্যক্তিকেই **'আ'রিফ'** হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। আর যদি কেউ প্রথমে মা'রিফাত সম্পর্কে অসতর্ক হয় এবং অচিরেই এ ব্যাপারে জীবিত হয়ে ওঠে এবং বুঝতে সক্ষম হয়

যে, সবকিছুর মূল সূত্র হচ্ছেন আল্লাহ, তাহলে এ ব্যক্তিকে বলা হয় **'মুতা'আরিফ'**।

কেউ যদি ইলম থাকাসত্ত্বেও আল্লাহর মা'রিফাত সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে অসতর্ক হয়, এবং মনে করে সকল কার্যের সূত্র সে নিজেই তাহলে, এ ব্যক্তিকে বলা হয়: **সাহী, অমনোযোগী, গাফিল, অসতর্ক, লাহী, বিলাসপ্রবণ, গোপনে আল্লাহর সাথে অংশীদারকারী [মুশরিক]**।

নফসের মা'রিফাতে প্রত্যেক অসমর্থিত গুণ (যা সংক্ষেপিত ইলমের মাধ্যমে জানা) যা নফসের মধ্যে শুরুতেই প্রকাশ হয়ে ওঠে, তা যদি কেউ সাথে সাথে ধরে ফেলেন ও সতর্ক হয়ে যান, তাহলে তাকে আ'রিফ বলা যাবে। অন্যথায় তিনি মুতাআ'রিফ না হয় গাফিল। আর এই সংক্ষেপিত জ্ঞান সম্পর্কে তিনি যদি খুঁটিনাটি বিষয় না জানেন, তাহলে তিনি অবশ্যই গাফিল। তার জন্য এরূপ জ্ঞান হয় ক্ষতির কারণ।

মনে করুন ইলমের মাধ্যমে কেউ জেনে নিল যে, গরিমা হচ্ছে নফসের একটি দোষণীয় গুণ। এরপর যখন এটা তার নফসে প্রকাশ পেলো, তিনি সাথে সাথে এ থেকে দূরে সরে পড়লেন। নিজেকে বিনয়ের পর্দা দ্বারা ঢেকে দিলেন। সুতরাং এ দোষণীয় গুণটি সম্পর্কে তিনি অবগত হলেন ও বুঝতে পারলেন তার নফসে এটি প্রকাশ পেতে পারে। পরবর্তীতে যাতে এটি পুনরায় আত্মপ্রকাশ করে না সে ব্যাপারে তিনি সতর্ক হবেন। এরূপ অবস্থাকেই বলে মা'রিফাতুন্ নাফস।

মোটকথা- নফসের মা'রিফাতে কয়েকটি স্তর আছে:

ক. আ'রিফ সর্বদাই আল্লাহর ইচ্ছার ওপর রাজী-খুশি।

খ. মুতাআ'রিফ আল্লাহর উপর সন্তুষ্ট।

গ. গাফিল ঘৃণা ও উত্তেজনাপ্রবণ।

আল্লাহর মা'রিফাতের কয়েকটি স্তর আছে। যেমন:

১. যা কিছু ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া হচ্ছে সেটা যে সম্পূর্ণটাই একমাত্র একক সত্তা থেকে হচ্ছে তা অবগত হওয়া।

২. যা কিছু ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া একক সত্তা থেকে প্রকাশ পায়, তা যে আল্লাহর গুণাবলীর বিকাশ সেটা জানা।

৩. প্রত্যেক গুণের মাহাত্ম্যে লুকিয়ে আছে আল্লাহর ইচ্ছার প্রকাশ, এ সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া।

৪. নিজের মা’রিফাতে আল্লাহর ইলমের গুণাবলী সনাক্তকরণ। নিজেকে ইলম, মা’রিফাত ও অস্তিত্বের বৃত্ত থেকে মুক্তকরণ।

আল্লাহর নৈকট্যের মাত্রা যার মাঝে যতো বেশি হবে, তার মাঝে তাতো বেশি আল্লাহর বিশালতা ও মহিমার প্রভাব ক্রিয়া করবে।

অজ্ঞতার মাঝে ইলম ক্রমান্বয়ে অর্জিত হয় [কারণ সত্যিকার ইলম অর্জিত হবে না যতক্ষণ না কেউ নিজেকে অজ্ঞ না ভাববে]। মা’রিফাতের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম জ্ঞান বৃদ্ধি পেতে থাকে। মহাবিস্ময়ের মহাবিস্ময় বাড়তে থাকে। আ’রিফ থেকে চিৎকার আসে:

“আমার মধ্যে তোমার মহাবিস্ময় আরো বাড়িয়ে দাও!”

এ সবই কিন্তু মা’রিফাতের ইলম- স্বয়ং মা’রিফাত নয়! কারণ মা’রিফাত হচ্ছে মগ্নতা যার ব্যাখ্যা অপূর্ণ কিন্তু এর মুখবন্ধ হলো ইলম। সুতরাং ইলম ছাড়া মা’রিফাত অসম্ভব। আর মা’রিফাত ছাড়া ইলম হলো বিপর্যয়।

ইলম ও মা’রিফাতের কয়েকটি আকার আছে:

১. ইলমে মা’রিফাত - মা’রিফাত সম্পর্কে ইলম।

২. মা’রিফাতে ইলম - ইলম সম্পর্কে মা’রিফাত।

৩. ইলমে মা’রিফাতে মা’রিফাত - মা’রিফাতের মা’রিফাত সম্পর্কে ইলম।

শেষোক্তটি হচ্ছে সর্বোৎকৃষ্ট আকার।

নবম পরিচ্ছেদ

হাল [আধ্যাত্মিক অবস্থা] ও মাক্বাম [আধ্যাত্মিক স্তর]

সুফিয়ায়ে কিরামের মতে, হাল হচ্ছে একটি গোপন ঘটনা যা সালিকের অন্তরে ঊর্ধ্বজগৎ থেকে সময় সময় অবতরণ করে। এটা যাওয়া-আসা করে যতক্ষণ না ঐশী আকর্ষণ সালিককে নিম্নতম স্তর থেকে সুউচ্চ স্তরে পৌঁছুয়ে দেয়।

মাক্বাম হচ্ছে সুলুকের রাস্তার বিভিন্ন স্তর। সালিক বিভিন্ন মাক্বামে অবস্থান করে। তরীকতের ভ্রমণকারী মাক্বামাত [স্তরসমূহ] অতিক্রম করে করে কাঙ্ক্ষিত গন্তব্যস্থলে পৌঁছুয়।

হাল যার সূত্র উর্ধ্বলোক, ভ্রমণকারীর রাস্তায় আসে না- বরং এর ওপর সালিক ভ্রমণ করে। অপরদিকে মাক্বাম, যার সূত্র নিম্নজগৎ, ভ্রমণকারীর রাস্তার বিভিন্ন স্তর।

সুফিরা বলেছেন: হাল হচ্ছে একটি উপহার (মাওহাব)। আর মাক্বাম হচ্ছে একটি অর্জন (কাস্ব)। হালের প্রবেশপথে কোনো মাক্বাম নেই। মাক্বাম থেকে আলাদা বস্তু হলো হাল।

মাশাইখে আজমের মধ্যে তর্কের সূত্র হিসাবে হাল ও মাক্বাম ব্যবহৃত হয়। কেউ হালকে মাক্বাম বলেন, কেউ মাক্বামকে হাল বলেন। কারণ সকল মাক্বামই হচ্ছে হালের শুরু। সবশেষে মাক্বামাত হচ্ছে: তাওবা, সবর, মুহাসিবা [আত্মসমালোচনা], মুরাকাবা [ভীতিসহ ধ্যান করা]।

উক্ত প্রতিটি মাক্বামের শুরু ও শেষ হয় হালের মধ্যে। হাল যখন কাস্বের সামীপ্যে পৌঁছুয় তখন এটি পরিণত হয় মাক্বামে। সকল হালই আলোকিত হয় মাকাসিব

[কাস্ব এর বহুবচন -অর্জনসমূহ] দ্বারা৷ আর সকল মাক্বাম আলোকিত হয় মাওয়াহিব [মাওহাবের বহুবচন -উপহারসমূহ] দ্বারা৷

হালের মধ্যে উপহারসমূহ হচ্ছে বহির্গামী ও অর্জনসমূহ অন্তর্মুখী৷ মাক্বামের মধ্যে অর্জনসমূহ হচ্ছে বহির্গামী ও উপহারসমূহ অন্তর্মুখী৷ খুরাসানের মাশাইখে আজম বলেন: হাল হলো আমলের উত্তরাধিকার৷ হযরত আলী ইবনে আবি তালিব রাদ্বিআল্লাহু আনহুর ভাষায়: 'হালের সাথে রাস্তার একত্রীকরণ সম্পর্কে আমাকে প্রশ্ন করো না৷'

মাক্বামাত হলো: তাওবা, সবর, জুহদ [কৃচ্ছ্রসাধনা] ইত্যাদি৷ এগুলো হচ্ছে হাল অবতরণের উপায়-অবলম্বন৷
কোনো কোনো শায়খ মন্তব্য করেছেন:
ক. হাল হচ্ছে সেটি যা স্থিরতা কিংবা সীমাবদ্ধতার মধ্যে নয়৷ এটা আসে ও চলে যায়- ঠিক যেরূপ বিজলিবাতি ক্ষণকালের জন্য স্থায়ী থেকে আবার নিশ্চিহ্ন হয়৷ আর যা থাকে তা পরিণত হয় হাদিসুন নাফসে৷

খ. যতক্ষণ পর্যন্ত এটি অনুভূত হবে না ততক্ষণ পর্যন্ত একে হাল বলা যাবে না৷ যেহেতু স্থিরতার জন্য প্রয়োজন স্থায়িত্ব তাই বিজলির মতো আসা যাওয়া হাল হতে পারে না৷

শেষোক্ত মতের উপর প্রতিষ্ঠিত আছেন সুহরাওয়ার্দিয়া তরীকাপন্থী মাশাইখে আজম৷

বলা হয়ে থাকে, যদি হাল চলে যায় তাহলে এটা হাদিসুন নাফসের সূত্র হতে পারে না৷ এর সূত্র একটি দুর্বল হাল, যা চমকানোর সময় শক্তিশালী নফস একে ধরে রেখেছে৷ নফসের নিকট শক্তিশালী হাল কখনো আভ্যাসিক হয় না৷ প্রত্যেক

ঘটনা যা বিজলি চমাকনোর মতো হয় এবং হালের মধ্যে অবসান হয়- এগুলোকে সুফিরা নিম্নলিখিত বাগধারায় প্রকাশ করে থাকেন:

১. লা'ইহ [স্পষ্ট], ২. তারিক [বিস্ফোরণোন্মুখ], ৩. লামিহ [চমকানো], ৪. বাদিহ [প্রতীয়মান] এবং ৫. তালি' [উদ্ভূত]।

হালের প্রকাশ পরেই আসে এর লুক্কায়ন। এ কথাটি বলেছেন, হযরত আবু উসমান হিরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। এটা সার্বক্ষণিক রিজার [পিরতৃপ্তির] দিকে ইঙ্গিত করে। আর সকল হালের রিজা হলো সন্দেহহীনতা। সুতরাং সার্বক্ষণিক হাল হাদিসুন নাফসের জন্য অপ্রয়োজনীয়।

কোনো মাক্বামকে [যা হচ্ছে সালিকের বর্তমান স্তর] পরবর্তী স্তরে নিয়ে যেতে উন্নতীকরণ কী সম্ভব? এর জবাবে হযরত জুনাইদ বাগদাদী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, 'এটা সম্ভব যে, প্রথম হাল শেষ হওয়ার পূর্বেই কোনো সালিক তার হালকে পরবর্তী উচ্চতর হালে নিয়ে যেতে পারে। সে প্রথম হালের তথ্যাদি আহরণ করে ও প্রয়োজনীয় উন্নতীকরণে অগ্রসর হয়।'

[শায়খ শাহাবুদ্দিন সুহরাওয়ার্দি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন] কোনো মাক্বামই উন্নতীরকণ সম্ভব নয় যতক্ষণ না ভ্রমণকারী উচ্চতর মাক্বাম থেকে নিচেরটি অবলোকন করবে। কিন্তু উচ্চতর মাক্বামে আরোহণের পূর্বে সেখান থেকে একটি হাল তার মধ্যে অবতরণ করে। এরপর সেখানে পৌঁছুয়। সুতরাং মাক্বাম থেকে মাক্বামে ভ্রমণকারী নিজের চেষ্টায় অগ্রসর হয় না- বরং এটা আল্লাহর অনুগ্রহ ও উপহার হিসাবে আসে। যতক্ষণ পর্যন্ত নিম্ন থেকে ঊর্ধ্বে আরোহণ নিকটস্থ না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত উপরস্ত হাল নিচের দিকে অবতরণ করবে না।

হাদিসে আছে, বান্দা যখন আল্লাহর দিকে এগিয়ে যায় তখন আল্লাহ তাঁর বান্দার দিকে এগিয়ে আসেন।

দশম পরিচ্ছেদ

তাওহীদ [আল্লাহর একত্ব] ও জাত [আল্লাহর অস্তিত্ব]

[দুনিয়ার] ভেজাল থেকে মুক্ত সুফিতত্ত্বের উলামায়ে কিরাম ইলমের সুরা পান করেছেন। তাদের রূহ ও হৃদয়ের সিঁড়ি খুব শক্ত হয়েছে। শুরুহীন নিশ্চিন্ততার সৌন্দর্য দ্বারা তাদের চোখের জ্যোতি তৈলাক্ত হয়েছে। তারা দেখেন, জানেন ও প্রাপ্ত হন ইলমে ইয়াক্বীন দ্বারা। তাদের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে 'কাশফ' [উন্মোচন], দৃষ্টি, 'জওক' [আনন্দ] এবং 'ওয়াজদ' [আধ্যাত্মিক সিদ্ধিলাভের অনুভুতি - পরমানন্দ] এর প্রমাণসমূহ।

তারা স্বাক্ষ্য প্রদান করেন যে, একমাত্র আল্লাহ ছাড়া কোনো ব্যক্তি বা কোনো বস্তু উপাসনার যোগ্য নয়। তিনি আল্লাহ একক, চিরন্তন, জন্ম দেওয়া থেকে পবিত্র, কারো সাহায্যের প্রয়োজন থেকে পবিত্র, পবিত্র সকল প্রকার সাদৃশ্য থেকে, তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই, না আছে তাঁর কোনো উজির-নাজির বা উপদেষ্টা। তাঁর নির্দেশের বিরোধী কোনো নির্দেশ নেই। তাঁর রাজত্বে কোনো দুশমনও নেই। তিনি চিরন্তন একক ও এককভাবে জানা।

তাঁর মহিমা ও পবিত্রতা থেকে বিতাড়িত আছে দুর্ঘটনাজণিত সবকিছু তথা- 'আকার', 'সাদৃশ্য', 'একত্রীকরণ', 'পৃথককরণ', 'সংযোগকরণ', 'অবরোহণ', 'নির্গতকরণ', 'প্রবেশ', 'রদবদল', 'অবক্ষয়', 'পরিবর্তন' এবং 'ভাষান্তর' ইত্যাদি।

তাঁর সৌন্দর্যের উৎকর্ষ ও তাঁর উৎকর্ষের সৌন্দর্য মানবিক চিন্তা-চেতনা দ্বারা উপলব্ধি থেকে মুক্ত। জিকির দ্বারা বস্ত্রাবৃত সমস্যা থেকে তাঁর চিরন্তনতার বিশলতা মুক্ত। তাঁর বর্ণনা করতে, বাগ্মীতার মাঠের সৈনিকদের ক্ষমতা সীমিত। তাঁর প্রশংসা

করতে মা’রিফাতের সর্দাররাও সম্পূর্ণ পঙ্গু। ইন্দ্রিয়ের উৎসর্গক্ষমতা, অনুমানমূলক আলোচনা ইত্যাদি থেকে তাঁর সম্পর্কে উপলব্ধির স্তম্ভ অতি সুউচ্চ। বিলীয়মান কল্পনাসমূহ ও উপলব্ধির ঘটনাসমূহ তাঁর মা’রিফাতের মাহাত্ম্যের ময়দানে প্রবেশ করতে অপারগ।

তাঁর মা’রিফাতের প্রবেশপথের কোনো দিকনির্দেশক নেই। শুধুমাত্র প্রভুত্বের পবিত্রদের মধ্যে [যারা পৌঁছুয়ে গেছেন কারণের সীমানায়] প্রকাশ হয় বিস্ময়বিহ্বলতা ও উত্তেজনা। তাঁর মহিমার আলোকবর্তিকার চমৎকারিত্বের মধ্যে কোনো রাস্তা নেই- আলোকরশ্মির মালিকের দৃষ্টিতে আছে শুধু অন্ধত্ব ও অজ্ঞতা।
তারা যদি বলে, ‘তিনি তাঁর অবস্থানস্থল সৃষ্টি করেছেন- কোথায়?’
জবাব হবে, ‘তিনি!’
তারা যদি বলে, ‘চোখের দৃষ্টিতে দৃশ্যমান সময় তিনি আনলেন- কখন?’
জবাব হবে, ‘তিনি!’
তারা যতি বলে, ‘সাদৃশ্যতা ও পর্যাপ্ততা সৃষ্টি করলেন তিনি- কিভাবে?’
জবাব হবে, ‘তিনি!’

তাঁর কোনো সীমা নেই। তাঁর সীমানার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত আছে শুরুহীন আদি ও শেষহীন অনন্ত। তাঁর ভাঁজকৃত ময়দানে ভাঁজ করা আছে অস্তিত্ব ও (জগতের) বাসস্থান। তাঁর শুরুতে সকল শুরু, সকল শেষ। তাঁর শেষে সবকিছুর শেষ, সবকিছুর শুরু। তাঁর বহির্মুখিতায় বস্তুর বহির্মুখী প্রকাশ, অভ্যন্তরের দিকে। তাঁর অন্তর্মুখিতায় শব্দসমূহের অন্তর্মুখী অংশ, বহির্মুখী। শুরুহীন তার অনন্তের শুরুহীন চিরন্তনের সংগ্রহ একটি দুর্ঘটনা মাত্র [হাদিস]। তাঁর অন্তহীন অনন্তের মধ্যস্থ সকল অন্তহীন অনন্ত একটি ঘটনা মাত্র [মুহদাস]। যা কিছুই সম্পৃক্ত আছে কারণে, উপলব্ধিতে, ইন্দ্রিয়ে ও অনুমানে- তা সবই প্রভুত্বের প্রকৃতি থেকে মুক্ত।

এসব ব্যাপার সবই ছিলো মুহদাসিত [দুর্ঘটনাসমূহ]- তবে মুহদাস [দুর্ঘটনা] উপলব্ধি ছাড়া, মুহদাস কিছুই করে না।

তাঁর অস্তিত্বের যুক্তি হচ্ছে তাঁর অস্তিত্ব। তাঁর স্বাক্ষ্যের প্রমাণ হচ্ছে তাঁর স্বাক্ষ্য। চিরন্তনতার সৌন্দর্য শুরুহীনতা ছাড়াই হচ্ছে শুরুহীন চিরন্তনের সৌন্দর্য। এ পর্যায়ে বুঝার সীমানা দুর্বলতা। 'ওয়াহিদ' [আল্লাহর এককত্ব] বুঝার বিষয় হচ্ছে, এই ওয়াহিদ ছাড়া কোনো মাওয়াহিদ [এককত্বের প্রবক্তা] এতে যেয়ে পৌঁছুতে পারবে না। যেখানে যেয়ে বুঝার ক্ষমতার শেষ, সেখানেই ব্যক্তির বুঝার ক্ষমতার শেষ হলো। কিন্তু ওয়াহিদ [আল্লাহর] এর সীমা তখনও শেষ হয় নি। যে মনে করে তার জ্ঞানে ওহাহিদের হাক্বিক্বাত পূর্ণাঙ্গরূপে ধরা দিয়েছে সে আসলে প্রতারিত ও অহঙ্কারপ্রবণ।

তাওহীদ হচ্ছে বিচ্ছিন্নতার অস্বীকৃতি ও সংগ্রহের সীমার স্বীকৃতি। হালের তাওহীদের শুরুতে এই ব্যাখ্যা জরুরী। কিন্তু সম্ভবত এর শেষে এসে বিচ্ছেদে পতিত ব্যক্তি সংগ্রহের সাগরে নিমজ্জিত হতে পারে। তাওহীদের মধ্যে [বুঝার ক্ষেত্রে] কয়েকটি স্তর আছে:

১. তাওহীদে ঈমানী: এটা হচ্ছে ঈমানের তাওহীদ।
২. তাওহীদে ইলমী: এটা হচ্ছে জ্ঞানের তাওহীদ।
৩. তাওহীদে হালী: এটা হচ্ছে হালের তাওহীদ।
৪. তাওহীদে ইলাহী: এটা হচ্ছে প্রভুত্বের তাওহীদ।

তাওহীদে ঈমানী

পবিত্র কুরআনের আয়াতমালার পরম্পরা ও হাদিস শরীফের অপরিহার্যতা মুতাবিক- তাওহীদে ঈমানী হলো, কোনো বান্দা তার অন্তর দ্বারা বিশ্বাস রাখে ও মুখে স্বীকৃতি দেয় যে, আল্লাহ এক, তিনি ছাড়া উপাস্য আর কেউ নেই, তিনিই সবাই ও সবকিছুর একমাত্র পালনকর্তা।

এই তাওহীদ হচ্ছে মুখরিব [সংবাদ-আনয়নকারী]। আর বিশ্বাসের আন্তরিকতা হলো খবর [সংবাদ]। বাহ্যিক ইলম থেকে উপকার লাভ করা ও তাতে অনড় থাকা হচ্ছে খোলা অংশীদারিত্ব থেকে মুক্তি। ইসলামের গণ্ডির ভেতর প্রবেশ থেকে আসে মুনাফা।

জুরুরতের ভিত্তিকে [সুফিরাসহ] সকল মুসলমান এই ঈমানী তাওহীদে সমানভাবে বিশ্বাসী। কিন্তু ঈমানের অন্যান্য স্তরের ক্ষেত্রে পার্থক্য বিদ্যমান।

তাওহীদে ইলমী

ইলমে তাওহীদের অধিকারী আলিম জ্ঞানের হৃদয় নামে খ্যাত ‘ইলমে ইয়ানিক’ [নিশ্চিততার জ্ঞান] দ্বারা উপকৃত হন। এই ইলমে ইয়াকিন এমন যে, তাসাওউফের রাস্তার শুরুতেই বান্দা ইয়াকিনের আকাঙ্ক্ষা থেকে সে জেনে নিয়েছে যে, সত্যিকার অস্তিত্বশীল ও পরম সত্তা মহাবিশ্বের একমাত্র প্রতিপালক আল্লাহ ছাড়া আর কেউ নয়। তাঁর জাত [প্রকৃতি] ও সিফাতের [গুণের] সামনে বান্দা [ইলমের মাধ্যমে] জানে তার নিজের জাত ও গুণ সম্পূর্ণ বিলুপ্ত।

পূর্ণাঙ্গ অস্তিত্বের আলো দ্বারা বান্দা প্রত্যেক স্বভাবের চমৎকারিত্বের স্বরূপ অনুধাবন করে। অনুধাবন করে চমৎকারিত্ব আল্লাহর গুণাবলীর আলোকরশ্মির মাধ্যমে। সে যখন লাভ করে ইলম, কুদরাত ও আকাঙ্ক্ষা- সে তখন জানে এগুলো যথাক্রমে আল্লাহর ইলম, আল্লাহর কুদরাত ও আল্লাহর আকাঙ্ক্ষা। অনুরূপ কথা সত্য সকল গুণ ও আমলের ক্ষেত্রেও।

এটা হলো তাওহীদের প্রথম পর্যায় যার স্বরূপ উন্মোচিত হয়েছে বিশেষ ব্যক্তি ও তাসাওউফশাস্ত্রে। এর মুখবন্ধ তাওহীদে আম এর স্তম্ভের সাথে মিলেছে। এ স্তরের তাওহীদের সাদৃশ্য অদূরদৃষ্টিসম্পন্ন লোকেরা তাওহীদে ইলমীর সাথে বলে থাকে।

বাস্তবে এটি তাওহীদে রাসমী [ধারণামূলক] ছাড়া আর কিছু নয়। উচ্চ পর্যায়ের স্তর থেকে এটা অনেক নিচে।

যে ব্যক্তির মধ্যে বুদ্ধি ও বুঝের ইচ্ছা বিদ্যমান, তার নিকট এই তাওহীদে রাসমী পাঠ ও শ্রবণের দ্বারা তাওহীদের অর্থ অনুমানভিত্তিক হবে। তার মনে ইলমে তাওহীদের একটি ধারণা [রাসম] অঙ্কিত হবে। এরপর নিজের মধ্যে হালী তাওহীদের স্বরূপ অনুপস্থিত থাকায় তর্কের মাঝে সে কিছু অর্থহীন শব্দ উচ্চারণ করে।

যদিও তাওহীদে ইলমীর স্তর তাওহীদে হালীর স্তরের নিচে অবস্থান করে, তথাপি তরীকতপন্থীদের নিকট এটি একটি মানসিক অবস্থা: "এর মিজাজ হচ্ছে তাসনিম, একটি প্রশ্রবণ যেখান থেকে আল্লাহর নৈকট্যশীলরা পানীয় পান করেন।" এটাই হচ্ছে এই তাওহীদের সূরার ব্যাখ্যা। এ কারণেই এই স্তরের অধিকারীরা প্রায়ই নিমগ্ন থাকে জাওক ও মহানন্দে। হালের মিজাজের প্রভাব হেতু তার মধ্যস্থ অন্ধকারের ছাপ অনেকটা বিলুপ্ত হয়ে যায়। সুতরাং সে তখন ইলম মুতাবিক আমলে লিপ্ত হয়। এই তাওহীদের স্তরে গোপন শিরকের কিছুটা বিলুপ্তি ঘটে।

তাওহীদে হালী

যখন তাওহীদের হাল হয়ে ওঠে মাওহীদের [একত্বের প্রবক্তা] স্বরূপ বর্ণনার জন্য জরুরী, তখন এটাকে তাওহীদে হালী বলে। তাওহীদের নূরের আরোহণের শ্রেষ্ঠত্বের মধ্যে অত্যল্প অবশিষ্টাংশ ছাড়া, এই স্তরের তাওহীদের মাধ্যমে তাঁর [আল্লাহর] অস্তিত্বের ব্যাপারে অন্ধকারাচ্ছন্নতা বিলুপ্ত হয়। তার হালের আলো ইলমে তাওহীদের আলোতে পরিণত হয় [যেমন, সকল নক্ষত্রপুঞ্জের আলো একত্রিত হয়ে সূর্যের আলোতে পরিণত হলো]।

তাওহীদে হালীর সূত্র হলো স্পষ্টকরণের আলো। আর তাওহীদে ইলমীর সূত্র হলো মুরাকাবা। তাওহীদে হালীর মাধ্যমে মানবতার অনেক ধারণাভিত্তিক ছাপ মুছে যায়।

তাওহীদের এই স্তর হেতু অধিকাংশ গুপ্ত শিরক উঠে যায়। তবে ধারণাভিত্তিক ছাপ সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয় না।

তাওহীদে ইলাহী

এটা তাওহীদের চূড়ান্ত স্তর। এটার মাধ্যমে শুরুহীন চিরন্তন প্রভুর একত্ব ছাড়া আর সবকিছু বিলুপ্ত হয়। একত্ব ও তাঁর প্রশংসা ছাড়া কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। শুরুহীন অনন্তের প্রশংসায় তিনি [আল্লাহ] একক ও ওয়াহিদ।

পর্দার আড়ালে থাকা ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে এই হাল কিয়ামত পর্যন্ত দূরে থাকবে [কিয়ামতের দিন সকল পর্দা সরে যাবে]। কিন্তু এই হাল দ্বারা যাদের পর্দা উঠে গেছে, সেই (কিয়ামত দিবসের পর্দান্মোচনের) প্রতিশ্রুতি এখানেই [ইহলোকে] বাস্তবিক হয়ে ওঠবে। এই তাওহীদের মধ্যে কোনো ধরণের ত্রুটি অবশিষ্ট নেই। স্বয়ং অস্তিত্বের মধ্যে ত্রুটি থাকায় ফিরিশতা ও মানবের [সাধারণ] তাওহীদের জ্ঞানে ত্রুটি বিদ্যমান। আর এ কথাটিই বলেছেন, শায়খ আবু আবদুল্লাহ আনসারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি।

একাদশ পরিচ্ছেদ

আখিরাত

সকল ইলমের মুখবন্ধ হচ্ছে সত্যিকার ঈমান। আকাঙ্ক্ষিত অন্তরে বিভিন্ন স্তরে যতক্ষণ পর্যন্ত ঈমানের শক্তি বৃদ্ধি পাবে না, ইলমে ইয়াকীনের কাফেলার সম্পদ হৃদয়ে স্থায়িত্ব লাভ করবে না। শুধুমাত্র প্রমাণপঞ্জী ও নবীদের উপদেশবাণীর ওপর নির্ভর করে তরীকতের দুর্গম পথে পাড়ি দেওয়া দুষ্কর ব্যাপার। তবে হ্যাঁ, একইসাথে ঈমানী আলোকে পদক্ষেপ, [আল্লাহর ইচ্ছার ওপর] আত্মসমর্পণ এবং মুর্শিদের প্রতি প্রেমাসক্তি, শ্রদ্ধাবোধ ও উপদেশ পালনের মাধ্যমে পাড়ি দেওয়া যেতে পারে। আল্লাহর রজ্জুকে আঁকড়ে না ধরলে ও রাসূলের সুন্নাতের অনুসরণ না করলে কষ্মিনকালেও মাক্বামে মাকসূদে পৌঁছুনো সম্ভব নয়।

যদি কেউ অপক্ক যুক্তি ও বুঝ নিয়ে অজ্ঞতার পাতাল থেকে ইলমের চূড়ায় আরোহণের ইচ্ছা করে তাহলে, সে বিরাট চেষ্টা-সাধনা চালাতে পারে- কিন্তু, সবশেষে সে নিজেকে প্রথম স্থানেই পড়ে থাকতে দেখবে। একটু অগ্রসর হলেও পুনরায় অবরোহণ করবে আগের জায়গায়। আর [আল্লাহ না করুন] যদি কাঙ্ক্ষিত রাস্তা বন্ধ হয়ে পড়ে তাহলে সে নিচে নেমে একেবারে নরকের গহ্বরে যেয়ে উপনীত হতে পারে।

গুপ্ত জগৎ ও আখিরাতের পরিস্থিতির ব্যাপারে [কুরআন মজিদ ও হাদিস শরীফে যেভাবে বর্ণনা এসছে সে মুতাবিক] পূর্ণাঙ্গ ঈমান রাখা সকলের জন্য ফরজে আইন। বিশ্বাস রাখতে হবে:

১. কবরের আজাবে, ২. কবরে মুনকার নকীর ফিরিশতাদ্বয়ের প্রশ্ন-উত্তরে, ৩. হাশরের ময়দানে একত্রিত হওয়ায়, ৪. কিয়ামত দিবসে, হিসাব-নিকাশ এবং মিযানে, ৫. সিরাতের সেঁতুতে, ৬. বেহেশত ও দোযখে এবং ৭. উম্মাহকে

জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষার্থে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়সাল্লামের শাফাআতের অধিকারে।

উক্তসব ব্যাপারে নিজে নিজে দুর্বল যুক্তির মাধ্যমে গবেষণা করা, ব্যাখ্যা খাড়া করে ভিন্নমত পোষণ করা ইত্যাদি বৈধ নয়। এ সবই বিশ্বাসের অন্তর্ভুক্ত। [আল্লাহ ও তাঁর রাসূলে বলেছেন আর আমরা বিশ্বাস করেছি পূর্ণাঙ্গভাবে, ব্যাস!]

মনে রাখা দরকার, ইলমে ঈমানীতে [ঈমানের জ্ঞানে] মানবিক উপলব্ধির [বুঝের] মাত্রা এর সীমা নয়। এ ক্ষেত্রে নবী-রাসূলরা পর্যন্ত [নিজের] উপলব্ধি ক্ষমতা ব্যবহার করেন নি। যা কিছুই ওহির মাধ্যমে তাঁদের নিকট এসেছে, তা-ই তাঁরা যথার্থ ও পূর্ণ সত্য হিসাবে দেখেছেন। তাঁরা এগুলো দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেছেন এবং যারতার ক্বওমের মধ্যে প্রচার করেছেন।

যুক্তিরও সীমানা আছে। এই সীমানা পার হলে, ভুল-ত্রুটি অনায়াসে এতে মিশে যায়। যেমন আমাদের ইন্দ্রিয়সমূহের মধ্যে সীমাবদ্ধতা আছে:
অনেক ব্যাপার আছে পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে দৃশ্যত অনুভব করা যায়- যেমন: দেখা, স্বাদ গ্রহণ, শ্রবণ করা, ছোঁয়া ও গন্ধ নেওয়া। উক্ত ইন্দ্রিয়গুলোতে যখন কিছু অনুভূত হয় এবং এগুলো সম্পর্কে ব্যক্তির পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান থাকে, তখন সে এটি সম্পর্কে বুঝতেও পারে সঠিকভাবে। [যেমন কেউ চোখ বন্ধ অবস্থায় একটি বল হাতে নিল। আর যদি এ বল সম্পর্কে তার কোনো পূর্ব জ্ঞান না থাকে, তাহলে সে কোন্ জিনিষ অনুভব করছে বলতে পারবে না।] কেউ যদি জানে কোনো বিশেষ বস্তুর অস্তিত্ব নেই, তখন সে বস্তু ইন্দ্রিয় দ্বারা অনুভব করলেও সেটা কী- সে তা বুঝতে অক্ষম।

আমাদের খিয়াল বা ধারণার মধ্যেও সীমাবদ্ধতা আছে। যেমন: কোনো বস্তু নিশ্চিহ্ন হওয়ার পর বহিরিন্দ্রিয়ের মাধ্যমে এ সম্পর্কে জ্ঞানলাভের মধ্যে ভুল-ত্রুটি প্রবেশ করতে পারে। অপর আরেক উদাহরণ হলো, কোনো এক ব্যক্তি কারো নাম শ্রবণ

করলো যাকে সে কখনও দেখে নি। সে তখন ঐ ব্যক্তির অবয়ব কল্পনার মাধ্যমে মনের মধ্যে অঙ্কন করবে। এরপর যখন ঐ ব্যক্তি বাস্তবে তার সম্মুখে উপস্থিত হয়, তাহলে তার ধারণা মুতাবিক সে হতে পারে কিংবা না-ও হতে পারে।

কল্পনার সীমাবদ্ধতা হলো: কেউ বস্তুর আকারের মধ্য থেকে যা সে উপলব্ধি করে তা-ই সে জানে- সে বস্তুর সবকিছু উপলব্ধি করতে অপারগ- ধারণা বা কল্পনার সীমাবদ্ধতা হেতু। এরপর যখন সে সীমার বাইরে যেয়ে বস্তুর স্বরূপ আরো উপলব্ধির চেষ্টা চালায় তখন তাতে ভুল-ত্রুটি প্রবেশ করে। যেমন:
কেউ রূহকে কল্পনা দ্বারা উপলব্ধি করতে পারে না। দেহের মধ্যে রূহের প্রবেশ, বাইর হওয়া, বিচ্ছিন্ন হওয়া, এর নৈকট্য ও দূরত্ব এবং দেহের সঙ্গে সম্পৃক্ততা ইত্যাদি কল্পনার মাধ্যমে জানা সম্ভব নয়। মূলত জগতের বস্তুসমূহের সীমানাও কেউ খুঁজে পাবে না। আর নিজের কল্পনার বাইরে যেয়ে তথা সীমানা পেরিয়ে বুঝার চেষ্টা কখনও বেজালমুক্ত হবে না।

আকল [যুক্তি] এর সীমাবদ্ধতা হলো: জগতের হিকমত ও কুদরতকে বুঝার মধ্যে। হিকমতের জগৎ বলতে যা বুঝায় তাহলো: কারণের অস্তিত্ব। মহাজ্ঞানী আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাজত্ব ও বস্তুজগতের সবকিছু সৃষ্টির পেছনে কারণ সম্পৃক্ত করেছেন। আর এ কারণের মাধ্যমেই, তিনি সৃষ্টির অস্তিত্বে নিয়ম-কানুন জড়িয়ে দিয়েছেন। তবে উক্ত কারণ ছাড়া আল্লাহ কর্তৃক জগতসৃষ্টি অসম্ভব তা কিন্তু নয়। হিকমত জগতকে বিন্যস্তকরণে আল্লাহ তা'আলা এর সঙ্গে কারণকে জড়িয়ে দিয়েছেন। হিকমত জগতের তত্ত্বাবধানে সৃষ্টি হয়েছে কারণ।

সুতরাং কেউ যখন কুদরতের জগত থেকে কিছু শ্রবণ করে, সে বলে এটা যুক্তিসম্মত নয়। কিংবা যখন সৃষ্ট জগতের মধ্যে সচরাচর কারণহীন [যুক্তি দ্বারা বুঝের বাইরে] পরিবর্তন ঘটে তখন সেটা তার কাছে অসম্ভব মনে হয়। সে জানে না, যা যৌক্তিক নয়, তা কৈফিয়ৎমুক্ত নয়। যেমন: পিতার বীর্য ছাড়া মায়ের গর্ভে সন্তানের আবির্ভাব অসম্ভব। কিন্তু কুদরতের জগতে এই যৌক্তিক সীমাবদ্ধতা নেই।

সেখানে অনেক ঘটনা ঘটে যা যৌক্তিক জগতের সঙ্গে সাংঘর্ষিক কিন্তু সম্পূর্ণ সত্য। যেমন: হযরত আদম [আ.] সৃষ্টি, হযরত বিবি হাওয়া [আ.] সৃষ্টি এবং হযরত ঈসা [আ.] সৃষ্টি।

যখন কেউ কুদরতের জগৎ সম্পর্কে যৌক্তিক আলোচনা বা চিন্তা করে তখন এতে ভুল-ত্রুটি প্রবেশ করবে। কুদরতী ঘটনা যুক্তির মানদণ্ডে বুঝাতে যেয়ে বিভিন্ন মত ও কারণ উপস্থাপন করে। এগুলো সঠিক না ভুলের তা কেউ বলতে পারবে না নিশ্চিতভাবে। অবশ্য, অজ্ঞতারোপণ কেউ মেনে নেয় না। ভুলের মূল কোথায় আছে সেটাও জানা থাকে না। তবে কেউ যদি তার নিজস্ব [হিকমাতের জগতের ক্ষেত্রে] সীমার মধ্যে অটল থাকে, তাহলে কিন্তু এসব ভুলের মধ্যে সে পড়তো না। মোটকথা, হিকমাতের বস্ত্রে আবৃত থাকাবস্থায় কেউ কখনও কুদরতকে বুঝতে সক্ষম হবে না- এটা একমাত্র ঈমানের মাধ্যমে অনুধাবনযোগ্য।

সম্ভবত, এরূপ কথা যখন কোনো মুনাফিকের কর্ণগোচর হয়, সে বক্তার যুক্তিকে প্রত্যাখ্যান করে মজার ছলে হাসবে। সে একে চিত্তবিভ্রম হিসেবে আখ্যায়িত করবে। অসহায়ের না আছে জ্ঞান। অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন ও ব্যাখ্যার গুরুজনরা এদের প্রতি করুণার দৃষ্টিতে তাকান। তাদের যৌক্তিকতার নীচতা ও বুঝের অভাব দেখেন। ঠিক কয়েদির মতো এরা হিকমাতের জগতে শৃঙ্খলিত এবং কুদরাতের জগত থেকে পর্দার আড়ালে। এরা গর্ভাশয়ের সঙ্কীর্ণ স্থানে ভ্রূণের মতো আবদ্ধ। ভাগ্যগুণে কেউ যদি এদেরকে বলে, 'এই সঙ্কীর্ণ গর্ভাশয়ের বাইরে আরেকটি জগৎ আছে। সেটার প্রশস্ততা বিরাট- এতে আছে মহাকাশ, প্রশস্ত স্থলভূমি ও জলভূমি, বিরাট সূর্য, চন্দ্র ও অন্যান্য বস্তু।' ভ্রূণ তা কখনও যুক্তি ও ধারণার মাধ্যমে বুঝতে সক্ষম হবে না। হয় সে তা বিশ্বাস করবে না হয় প্রত্যাখ্যান করবে।

অনুরূপ হিকমাতের সঙ্কীর্ণ জগতে বসবাসকারীরা ঈমান ছাড়া কুদরতের জগৎ সম্পর্কে কিছুই অনুধাবন করতে পারবে না। হিকমাতের সঙ্কীর্ণ গর্ভ থেকে মানবাত্মা যদি প্রশস্ত গায়েব ও কুদরতের জগতে বেরিয়ে না আসে, অথবা তার স্বাভাবিক

মৃত্যু- যাকে তারা 'দ্বিতীয় জন্ম' বলে, না ঘটে, তহলে সে কখনো এগুলো সম্পর্কে ধারণাই করতে পারবে না।

ঈমান গ্রহণের পূর্বে তারা যাকিছুই গ্রহণ করেছে, তা সবই চেখোর দৃষ্টির [অর্থাৎ পঞ্চেন্দ্রিয় ও ধারণাভিত্তিক জ্ঞানের] ওপর নির্ভরশীল। যতক্ষণ না মানবতার পর্দা উন্মোচন হবে, ততক্ষণ শুধুমাত্র চোখই চক্কর দেবে। একমাত্র অভ্যন্তরীণ স্বাদ (যার অর্থ ঈমান) ছাড়া কেউ কখনও জাওক এর [মহানন্দের] অনুসন্ধান পাবে না। একদল লোক আছেন, যাদের মধ্যে এই ক্ষমতা অসৃষ্ট আছে। অপর আরেক দল আছেন যাদের মধ্যে এই ক্ষমতা সৃষ্ট আছে।

মানুষের ইচ্ছার মধ্যে রোগ থাকলে, তারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। তাদের থালায় সত্যের খাবার- ঈমানের ইলমের মতো, তিক্ত লাগে। ঈমানদার প্রত্যেকের ওপর এটা ফরয যে, আল্লাহর সন্তুষ্টিকল্পে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত দ্বীনকে সমুন্নত রাখা। এজন্য প্রয়োজন নিষ্ফল আমলের বিলুপ্তসাধন, ভুল-ভ্রান্তিতে পতিত মানুষের বাতিল প্রচারণার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলা এবং মানবরূপী শয়তানের শক্তিকে উৎখাত করা।

হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দ্বীন ও শরীয়ত হলো সত্য-সরল পথ। এটাই হচ্ছে সঠিক মহাসড়ক। তিনি হচ্ছেন প্রেরিতজনদের মধ্যে সর্বশেষ, প্রভুর পক্ষ থেকে উভয় জগতের একান্ত নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি। তাঁরই উম্মাতের মধ্যে হাজার হাজার মহাত্মন ব্যক্তি [সিদ্দিকীন, সালিহীন, শুহাদায়ে কিরাম] এ জগতে এসেছেন, উক্ত মহাসড়কে চলেছেন- সড়ক থেকে উৎখাত করেছেন আবর্জনা, কাঁটা, সন্দেহ ও সংশয়। প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন [তরীকতের] এ রাস্তার জ্ঞান ও এর বিভিন্ন স্তর। প্রতিটি পদক্ষেপের দাগ রেখে গেছেন। প্রত্যেক প্রদীপ্ত অবস্থানকে চিহ্নিত করেছেন। রাস্তার ডাকাতদের থেকে বেঁচে থাকার জন্য রেখে গেছেন এ রাস্তার আন্তরিক পথিক দৃঢ়সংকল্পের দিকনির্দেশক [খলিফা]।

যদি কোনো স্তর অনুসন্ধানী দাবী করেন, রাস্তা সরল-সেজা নয়- এবং মানুষকে অপর আরেক রাস্তায় চলতে আহ্বান জানান, তার এরূপ বাক্তব্য মূল্যহীন। এটা প্রত্যাখ্যানের জন্য এ রাস্তার অসংখ্য সত্যান্বেষীদের কৃর্তক প্রতিষ্ঠিত নিয়ম-কানুনের ওপর বিশ্বাস ও আমল একান্ত জরুরী।

প্রতারক ও ভ্রান্ত লোকজন এমন একটি দল যারা বাহ্যত ইসলামের লেবাস পরিধান করে। কিন্তু বাস্তবে অভ্যন্তরীণ দিক থেকে ইসলামের প্রতি ঘৃণা ও কুফর ধারণ করে। তারা বাহ্যিকভাবে ইসলাম ও মুসলামনদের মধ্যেই মিলেমিশে থাকে। মানুষের নিকট নিজেদেরকে 'হক্কানী উলামা' হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করে এবং হিকমতদার বলে। বাস্তবে এরা এ জগতকে চিরন্তন ভাবে ও পুনরুত্থানকে অস্বীকার করে। ইসলামের সত্যিকার উলামা ও শায়খদের প্রতি শত্রুতা পোষণ করে।

সত্যিকার হক্কানী উলামায়ে কিরাম হচ্ছেন শরীয়তের মহাকাশে তারার মতো। তাঁরা শরীয়তকে মানবরূপী শয়তানদের আক্রমণ থেকে রক্ষা করে যাচ্ছেন। তাঁদের উজ্জ্বল শ্বাস ভেদ্য উল্কার মতো প্রবলভাবে বর্ষিত হয় ওদের [মানবরূপী শয়তানদের] ওপর, যারা শরীয়তের অন্তর্নিহিত সত্যকে গোপন রাখতে ও মুছে দিতে অভ্যস্ত আছে। এদের প্রতারণামূলক কুকর্ম থেকে মানুষকে সতর্ক করে যাচ্ছেন।

তবে এই প্রতারকরা যেখানেই প্রভাব বিস্তার করেছে, সেখানেই মানুষকে 'হক্কানী উলামা' থেকে দূরে রেখেছে। তারা প্রথমে ওসব মানুষের অন্তরে আক্রমণ চালায় যা শয়তানের প্রভাব হেতু দুর্বল হয়েছে। তারা তাদের ঈমানকে বিনষ্ট করে। পবিত্র সাধারণ হৃদয়কে স্বাভাবিকতার পবিত্রতা থেকে ফিরিয়ে দেয় কলুষতার দিকে। তাদেরকে ইসলামের ঢালের নিরাপত্তা থেকে বঞ্চিত করে। ঈমান ও দ্বীনের প্রান্তে প্রতারণার তীর বিদ্ধ হওয়া নিশ্চিত করে। গোপনে ভদ্র-নম্র পলক দ্বারা মানুষকে ধ্বংসের দিকে ডেকে নেয়।

এরা হচ্ছে ঈমানের দুশমন। শয়তানের ভাই। [শরীয়তের] আইন সম্পর্কে অজ্ঞ। হতাহতের কারণ। উভয় জগতের প্রভু আল্লাহ তা'আলার নিকট এদের প্রতিরোধের চেয়ে আরও উত্তম কোনো আমল নেই। তাদের প্রতারণা ও মুনাফিকীর ভিতকে উপড়ে ফেলার চেয়ে আরও উত্তম কোনো কাজ নেই।

এদের প্রতারণা ও ভ্রান্তিকে উৎখাত করার লোক হচ্ছেন আল্লাহর ইচ্ছার ওপর আত্মপমর্পিত ব্যক্তিবর্গ। যথা:

১. কুদরতওয়ালা ব্যক্তিবর্গ।

২. ইলমের অধিকারী ব্যক্তিবর্গ।

কুদরতওয়ালা ব্যক্তিরা কাজ করেন: দস্যুতা ও কুরবানীর মাধ্যমে। কাঠিন্যতা ও শাস্তির মাধ্যমে। অস্বীকৃতি ও বিতাড়নের মাধ্যমে।

ইলমওয়ালা ব্যক্তিরা কাজ করেন: [ভ্রষ্টদের] প্রতারণা, মুনাফিকী ও ধর্মদ্রোহিতা প্রকাশের মাধ্যমে।

এই দু'টি পদ্ধতির মাধ্যমে উৎখাতের নির্দেশ ও ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে যাদেরকে, তাঁরা হয় তা মানবেন ও উত্তম প্রতিদান পাবেন। না হয়, অমান্য করবেন ও প্রতিশোধ গ্রহণ করবেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

ইলমে কিয়াম [বান্দার পর্যবেক্ষক হিসাবে আল্লাহ- এ সম্পর্কে জ্ঞান]

সুফিয়ায়ে কিরামের মতে, '**ইলমে কিয়াম**' হচ্ছে একটি বিশেষ জ্ঞান। এরই মধ্যে নিহিত সকল আন্দোলন ও স্থিরতা। অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিকভাবে বান্দা দেখতে পায় যে, সর্বাবস্থায় আল্লাহ তা'আলা তাকে পর্যবেক্ষণ করছেন। আর এ সম্পর্কে কুরআন শরীফেও ইরশাদ হয়েছে।

সুতরাং, বান্দা নিজেকে অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিকভাবে আল্লাহর নির্দেশনাবলী ও আইন-কানুন দ্বারা অলঙ্কৃত রাখে এবং তাঁর থেকে দূরে সরে পড়ার বস্ত্র পরা থেকে বিরত থাকে।

এটা একটি মহামূল্যবান জ্ঞান। সুফি পরিভাষায় একে 'ইলমে মুরাকাবা' বলে। যে কেউ একে তার অভ্যন্তরীণ অভ্যেসে পরিণত করতে সক্ষম হয়েছে, সে লাভ করেছে প্রশংসিত মাকাম ও মহামূল্যবান হালসমূহ। সকল ব্যাপারে তার শিক্ষক হয়ে যায় আল্লাহভীতি ও [তাঁর প্রতি] শ্রদ্ধাবোধ। এ কথাটিই বলেছেন হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

হযরত সাহল ইবনে আবদুল্লাহ তুসতরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর মুরীদদের এই জ্ঞানের নীতি সম্পর্কে উপদেশ দিয়ে বলতেন:

'চারটি বিষয় থেকে নিজেকে কখনও গাফিল রাখবে না:

১. তোমার মধ্যে প্রত্যেক হালের অবস্থায় যা 'ইলমে ইয়াকীন' হবে, এর পর্যবেক্ষক ও প্রত্যক্ষদর্শী হচ্ছেন আল্লাহ।

২. তোমার যাবতীয় আমল শুধুমাত্র আল্লাহর নির্দেশ ও তাঁর সন্তুষ্টি ছাড়া আর কোনো কিছুর সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকবে না।

৩. উপরোক্ত দু'টি অবস্থার জন্য সর্বদা আল্লাহর সাহায্য ও তাঁর অনুগ্রহের আবদার জানাবে।

৪. এই তিনটি বিষয়ের ওপর মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত অধ্যবসায়ী থাকবে। কারণ এগুলোর মধ্যেই নিহিত ইহ ও পরকালের যাবতীয় উত্তম বস্তু। এরই মধ্যে বিদ্যমান অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক সকল প্রশান্তি।

ইলমে ইয়াকীন হচ্ছে হৃদয়ের জিকির। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আন্দোলন ও হৃদয়ের দৃঢ়তা দু'টি বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত:

১. নিজের ওপর কিয়াম।

২. নিজের ওপর শুহুদে হাক্ব।

সুতরাং, নির্দেশনা মুতাবিক আন্দোলন ও দৃঢ়তা প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। এগুলোকে তারা বলেন:

ক. জিকরে ফরিদ্বা - আল্লাহর হুকুমের জিকির।

খ. জিকরে জবান - জিহ্বার জিকির।

গ. জিকরে ফজিলাত - উৎকর্ষতার জিকির।

তাই তাঁরা [সুফিরা] বলেন:

'গতকাল' এর মৃত্যু ঘটেছে।

'আগমীকাল' এর জন্ম হয় নি।

'আজ' হলো মৃত্যুর যন্ত্রণা।

যে কেউ 'অতীতের' কিংবা 'ভবিষ্যতের' জিকিরে লিপ্ত সে ধ্বংসের মধ্যে আছে।

মানুষের নিরাপত্তা ও মুক্তির চাবিকাঠি হচ্ছে সময়ের হুকুমের মধ্যে [ইলমে কিয়াম] আনন্দময় আমল করে যাওয়া। কারণ এ হালের মধ্যেই ঘটে:

(১) শ্বাস-প্রশ্বাস। (২) বিশ্রাম। (৩) অলসতা। (৪) অনুগ্রহ।

অন্যান্য ইলম থেকে এই ইলম [ইলমে কিয়াম] অনেকটা বেশি প্রিয়, রহস্যময় ও উপকারী। যে কেউ সর্বদা এসব মহামূল্যবান সম্পদ লাভের আশা রাখে, সে সকল [দুনিয়াবী] সম্পর্কচ্ছেদ করে। সে অচেনাদের পরিহার না করে, নফসের বিরোধিতা করে।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

ইলমে হাল [আধ্যাত্মিক অবস্থার জ্ঞান]

সুফিদের জ্ঞানসমূহের মধ্যে একটি বিশেষ জ্ঞানের নাম হচ্ছে '**ইলমে হাল**'। এতে নিহিত আছে: হৃদয়ের প্রসঙ্গ ও অবস্থার রহস্যময়তার বিবেচনা (যা বান্দা ও প্রভুর সম্পর্ক বিষয়ক)। আছে আধ্যাত্মিক লাভ ও ক্ষতির ব্যালান্স, প্রমাণের পরশপাথর দ্বারা শক্তি ও দুর্বলতার ব্যালান্স। এসব ব্যাপারের হাক্বিক্বাত অবলোকন ও শরীয়তের আইন-কানুন পালনের মাধ্যমে সালিক হয়তো নিজের মধ্যে হালের সৃষ্টি করতে পারে।

প্রত্যেক হালের মধ্যে নিজের ওপর একেকটি নিয়ম বর্তায়, যা নির্ভরশীল:

১. ওয়াক্ত [সময়] ও ২. মাকাম [স্তর] এর ওপর।

যেমন, '**রেজার হাল**' থেকে নিজের ওপর একটি আইন বর্তায়- তাহলো, নফসের নিয়ন্ত্রণ। আর আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্দেশমূলক বিপর্যয় ওয়াক্তের সঙ্গে সম্পৃক্ত যখন:

(ক) বিপর্যয় বৃদ্ধি পাওয়ার একটি আইন আছে- যতক্ষণ রেজার হাল বৃদ্ধি পাবে ততক্ষণ তা স্থায়ী হবে। [অর্থাৎ বিপর্যয় বা বিপদাপদ যতো বেশি, ততো বেশি রেজার হালের শক্তি]

(খ) বিপর্যয় বন্ধ হওয়ারও একটি আইন আছে- আল্লাহর নিকট সাহায্যের জন্য আবদার করা, যাতে তিনি উন্নত অবস্থার দরজা খুলে দিন। নফসকে আন্দোলন থেকে মুক্ত করেন।

এ অবস্থায় রেজার হালকে বৃদ্ধির আরেকটি নির্দেশ ও আইন:

ক. আল্লাহর নির্দেশের সঙ্গে সামঞ্জস্যশীল রেজা ও আনন্দ।

খ. বিরোধিতা, অস্বীকৃতি ও বিলাপ।

উপরোক্ত উভয় স্তরে বৃদ্ধির আইন বিরোধী, আরেক আইন হলো রেজার হালের হ্রাস পাওয়া। হযরত সাহল ইবনে আবদুল্লাহ তুশতারী রাহিমাহুল্লাহ বলেন: "বান্দা যতক্ষণ পর্যন্ত নিজের হাল সম্পর্কে জ্ঞাত হয়ে একে সংরক্ষণ করবে না এবং এর ওপর নির্ভর করে আল্লাহর আনুগত্যশীল হবে না, ততক্ষণ সে নিরাপদ নয়।"
তাঁকে প্রশ্ন করা হলো: ইলমে হাল কা'কে বলে? জবাব দিলেন: "নিজের ইচ্ছার অস্বীকৃতি ও চাওয়ার বিসর্জন নিয়ে আল্লাহর সাথে যে সম্পর্ক গড়ে ওঠে; সর্বদা সকল অভিপ্রায় থেকে মুক্ত অবস্থা; যখনই নিজের মাঝে দৃশ্যমান হয় কোনো পরিকল্পনার প্রতি আকর্ষণ তখনই, অস্বীকৃতি জানানো; যা কিছু নিজে জানে তা হালকে বিতাড়নের কারণ বলে উন্মোচন হওয়া ইত্যাদি।"

এখানে হযরত সাহল রাহমাতুল্লাহি আলাইহি সকল আকাঙ্ক্ষা বিসর্জন দেওয়াকে 'ইলমে হালের' গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হিসাবে বর্ণনা করেছেন। এর কারণ হলো, এই হালের থেকেও উন্নত কোনো হাল নেই।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

ইলমে ইয়াকীন [নিশ্চিত জ্ঞান]

ইলমে ইয়াকীনের বেশিষ্ট্য হলো: মানবতার গোপন অবস্থায় আকল [যুক্তি] ও হাদিস [বর্ণনা] ছাড়াই ওয়াজদ [আধ্যাত্মিক আনন্দবোধ] ও জওক [হর্ষবোধ] এর প্রমাণাদির মাধ্যমে হাক্বিক্বাতের [সত্যের] আলোর প্রকাশ হওয়া।
সুফিয়ারে কিরাম এই আলোকে সনাক্ত করেন:

ক. পর্দার আড়ালের - ঈমানের আলো বলে।

খ. পর্দা ভেদে - ইয়াকীনের আলো বলে।

অবশ্যই, যখন এই আলো হৃদয়ের প্রতিনিধি হিসাবে স্থায়ী হয়, তখন একমাত্র ঈমানের আলো ছাড়া এতে আর কোনো আলো থাকে না। মানবতার পর্দা ছাড়া এটা হলো ইয়াকীনের আলো। যতক্ষণ পর্যন্ত অস্তিত্বের একটি অবশিষ্টাংশ বিদ্যমান থাকে, ততক্ষণ মানবতার গুণাবলীর মেঘমালা মানবতার আত্মা থেকে উর্ধ্বারোহণ করে। আর এই মেঘমালা হাক্বিক্বাতের সূর্যকে ঢেকে দেয়। কখনও কখনও এই মেঘমালা চতুর্দিকে ছিটকে পড়ে। ফলে, আগত আলোর ঝলক ওয়াজদের অবস্থায় হৃদয়ে জওকের সৃষ্টি করে। ঠিক যেরূপ শীতের সময় হঠাৎ করে সূর্যের উষ্ণ আলোর ছোঁয়া আন্দোলিত করে তুলে দেহকে, ঠিক তদ্রূপ হাক্বিক্বাতের অংশুজালের উষ্ণতা সৃষ্টি করে অন্তরে জওকের হাল [হর্ষবোধের অবস্থা]।

মনে করুন, সূর্য হচ্ছে হাক্বিক্বাতে হাক্বিক্বাত [সত্যের সত্য]। এর অংশুজাল যেনো হাক্বিক্বাতের চমক। এটা নিরাপত্তার আলোর পর্দার বাইর থেকে চমকাচ্ছে। প্রকাশ হচ্ছে ইয়কীনের আলোর পর্দাকে ভেদ করে। আর শীতে জর্জরিত দেহের ওপর - যেমন স্ব-গুণাবলীর পর্দায় আবৃত মানবের দেহে পতিত হচ্ছে ঈমানের নূর হিসাবে এই হাক্বিক্বাতের অংশুজাল।

অন্তরে ঈমানের নূর যখন দৃঢ় হয়, ইয়াকীনের আলো তখন সময় সময় ঔজ্জ্বল্যতাসহ সেখানে চমকাতে থাকে। ঠিক যেভাবে হাদিসে উল্লেখিত হয়েছে।

ইয়াকীনের তিনটি স্তর আছে। এর ফলে ঠিক যেরূপ সূর্যের অস্তিত্ব, তদ্রূপ ব্যক্তি সম্পূর্ণরূপে সন্দেহমুক্ত হয়। স্তরগুলো হলো:

১. ইলমে ইয়াকীন: এটা অর্জিত হয় সূর্যের চমৎকারিত্ব ও এর উষ্ণতা উপলব্ধি করে হিদায়াত প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষার মাধ্যমে।

২. আইনুল ইয়াকীন: এটা অর্জিত হয় সূর্যের দেহকে দর্শনের মাধ্যমে।

৩. হাক্কুল ইয়াকীন: এটা অর্জিত হয় চোখের আলোকে সূর্যের আলোর মধ্যে বিচ্ছুরণের মাধ্যমে।

এরপর-

ক. ইলমুল ইয়াকীনের মাধ্যমে হয়ে যায় জানা, সত্যাখ্যান ও স্পষ্ট।

খ. আইনুল ইয়াকীনের মাধ্যমে হয়ে যায় প্রকাশিত ও স্বাক্ষ্যপ্রাপ্ত।

গ. হাক্কুল ইয়াকীনের পরিণাম হিসেবে দু'টি দিক উন্মোচন হয়: প্রত্যক্ষদর্শী ও প্রত্যক্ষদর্শন এবং দর্শক ও দর্শিত। অর্থাৎ দেখনেওয়ালা হয়ে যায় দেখার চোখ; চোখ হয়ে যায় দেখনেওয়ালা।

ইয়াকীন সম্পর্কে কথা হলো: এর মূল ইলমে ইয়াকীন ও এর শাখা-প্রশাখা আইনুল ইয়াকীন ও হাক্কুল ইয়াকীন। 'ঈমানের' অনেক স্তর আছে। এর একটির নাম ইয়াকীন। হৃদয়ে সন্দেহের বিঘ্ন সৃষ্টি থেকে মুক্ত রাখে ইয়াকীন। একে শরীয়তের ভাষায় 'ঈমান' বলে।

নির্ভরযোগ্য দালাইলের মাধ্যমে যা উপস্থাপিত হয় তা ইলমে ইয়াকীন থেকে দূরে। এর কারণ হলো:

ক. এটা (দালাইলের মাধ্যমে নির্ভরযোগ্য উপস্থাপন) হচ্ছে প্রমাণ করার ইলমের অন্তর্ভুক্ত।

খ. আর সেটা (ইয়াকীন) হচ্ছে হালের ইলম।

একামত্র হাক্বিক্বাতের সূর্যোদয় ছাড়া হৃদয়ে সন্দেহের যাবতীয় অন্ধকার মুছে যায় না।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

নফস [নিজ নির্যাস]

নফসের দু'টি অর্থ আছে:

ক. নফসে শাই [কোনো বস্তুর নফস]: এটা হচ্ছে বস্তুর জাত [স্বভাব] ও হাক্বিক্বাত [সত্য]। তাই তারা [সুফিরা] বলেন: "নিজের নফসের মাধ্যমে কোনো কিছু দণ্ডায়মান আছে।"

খ. নফসে নাতিক্বায়ে ইনসানী [মানবিক যৌক্তিক নফস]: এটা হচ্ছে দৈহিক গড়ন-গঠনের বিমূর্ততা। একে তারা [সুফিরা] বলেন: "মানবিক প্রাকৃতিক আত্মা। এটা একটি ঔজ্জ্বল্যতা (যা মানবিক সুউচ্চ আত্মা থেকে এর ওপর স্থাপিত হয়েছে।) এরই মাধ্যমে দেহ পরিণত হয়েছে ন্যায়-অন্যায়ের স্থানে।" ঠিক এ কথাই পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে।

যাবতীয় গুণাবলীর মধ্যে নফসের মা'রিফাত কঠিন। কারণ নফসের স্বাভাবিকতা হলো বহুরূপী। ক্ষণকালের মধ্যেই তার রূপ বদলাতে পারে। ঘন্টায় ঘন্টায় তার আকারে পরিবর্তন আসতে পারে। এটা হচ্ছে অস্তিত্বের '**বাবেল শহরে**' '**হারুতের**' মতো। নফস মুহূর্তে আরো একটি গায়েবী ছবি পানিতে প্রদর্শন করে, শুরু করে আরো একটি যাদু।

নফসের মা'রিফাতের ইঙ্গিত পাওয়া যায়, আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক ও মা'রিফাতের মধ্যে। নফসের যাবতীয় গুণাবলী জানা এবং এ সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ জ্ঞানলাভ কোনো সৃষ্ট প্রাণীর ক্ষমতার মধ্যে নেই। এমনকি আল্লাহর মা'রিফাতের সারাংশে পৌঁছুনোও খুব কঠিন। আরো কঠিন নফসের মা'রিফাত সম্পর্কে জানা। যেমনটি বলেছেন হযরত আলী ইবনে আবি তালিব রাদ্বিআল্লাহু আনহু।

নফসের নামসূহ হচ্ছে:

১. নফসে আম্মারা [ধৃষ্ট নফস]: এটা নফসের প্রাথমিক অবস্থা। যতক্ষণ এর আন্দোলন থাকবে ততক্ষণ এটি অস্তিত্বশীলও থাকবে।

২. নফসে লাউওয়ামা [নিজের প্রতি নিন্দা জ্ঞাপনীয় নফস]: এটা মধ্যম অবস্থা। এ সময় এটা হৃদয়ের আন্দোলনের অনুগত থাকে। তবে নফসে আম্মারার সকল জেদ পুরোপুরি বিলুপ্ত হয় না। যদিও নিজেকে ধিক্কার করার প্রবণতা বৃদ্ধি পায়।

৩. নফসে মুতমাইন্না [প্রশান্ত নফস]: এটা শেষের অবস্থা। এ সময় নফসের মধ্যে অবজ্ঞা ও কলহ বিলুপ্ত হয়ে যায়। হৃদয়ে বিরাজ করে প্রশান্তি। সর্বাবস্থায় রেজার মাক্বাম উন্মুক্ত হয়ে পড়ে। ইবাদতের মধ্যে আসে পূর্ণাঙ্গ আনুগত্য।

শুরুতে যখন নফস তার স্বাভাবিকতার মধ্যে দৃঢ় অবস্থানে থাকে, তখন সে সর্বদাই তার নিজের সৃষ্ট আইন-কানুনের প্রতি আকর্ষিত হয়। উন্নত স্থানের রূহ ও হৃদয়কে শান্তি দানের চেষ্টা করে। তাদের নিকট প্রতিনিয়ন উপস্থান করে নতুন নতুন দৃশ্যাবলীর চমৎকারিত্ব। দালাল হিসাবে শয়তান নফসের মূল্যহীন রাজকীয় ক্ষমতাকে অলঙ্কৃত করে ও এ থেকে রূহ ও হৃদয়ে সৃষ্টি করে আন্দোলন, যাতেকরে সে মর্যাদাশীল রূহকে নীচে নামাতে পারে। পবিত্র হৃদয়কে কলুষিত করতে পারে। এ কথাগুলো বলেছেন, হযরত সাহল ইবনে আবদুল্লাহ তুসতারী, হযরত আবু ইয়াযিদ বিস্তামী ও হযরত জুনাইয়দ বাগদাদী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিম।

একদল লোক মনে করেন যৌক্তিক নফস ও হৃদয় একই জিনিস। এর কারণ হচ্ছে, তারা দেখতে পান সবশেষে, নফসের বিশ্রাম অবস্থার ব্যাখ্যা ও হৃদয়ের পরিতৃপ্ত অবস্থার ব্যাখ্যায় কোনো পার্থক্য নেই। সুতরাং তাদের সন্দেহ, নফসে আম্মারা ও নফসে লাউওয়ামার মধ্যে কোনো মৌলিক পার্থক্য নেই।

নফসে মুতমাইন্না কিন্তু সত্যিই আলাদা আরেক নফস। সন্দেহবাদীরা জানেন না যে, নফসে মুতমাইন্নার মধ্য থেকে ভবঘুরে খেয়ালীপনা মুছে দেওয়া হয়েছে। একে সজ্জিত করা হয়েছে সম্মানিত প্রশান্তি ও বিশ্রামের পোশাকে। এটার রং হৃদয়ের রঙে রঞ্জিত। যখনই নফসে আম্মারা হৃদয়ের রং গ্রহণ করেছে তখনই হৃদয় রঞ্জিত হয়েছে [উত্তম আমলের সন্ধানে] রূহের রঙে।

ষষ্ঠদশ পরিচ্ছেদ

নফসের বিভিন্ন দোষণীয় গুণ

মানুষের মধ্যে দোষণীয় গুণের সূত্র হচ্ছে নফস। অপরদিকে প্রশংসনীয় গুণের সূত্র হলো রূহ।

দোষণীয় গুণ মোট ১০টি। যথা:

১. হাওয়া [কামনা]

নফস সর্বদা তার কামনা-বাসনা পূর্ণ করতে ইচ্ছুক। তার বক্ষস্থলে প্রকৃতির কামনা স্থাপন করতে চায়। সে চায় তার কোমরে বেঁধে দিতে কামনা-বাসনার কোমরবন্ধ। চায় [না জেনেই] আল্লাহর সঙ্গে শরীক করতে, ঠিক যেভাবে কালামে মজীদে উল্লেখিত হয়েছে।

নফসের এই প্রবণতা আল্লাহর ভালোবাসাসহ কৃচ্ছ্রসাধনা ছাড়া দূর করা সম্ভব নয়।

২. নিফাক [কপটতা - মুনাফিকী]

অনেক বাহ্যিক অবস্থার সাথে নফসের অভ্যন্তরীণ সামঞ্জস্যতা থাকে না। যেখানে সে মানুষের মধ্যে উপস্থিত থাকবে সেখানে সে অনুপস্থিত থাকে। মানুষের সঙ্গ অবস্থায় নফস [এর কুকর্ম] নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। বাহ্যত তার মধ্যে পরিদৃষ্ট হয় আন্তরিকতা। কিন্তু মানুষের অনুপস্থিতিতে এর বিপরীত অবস্থানে থাকে।

নফসের এই প্রবাণতা বা বদগুণকে বিলুপ্তির উপায় হলো, ইসলাহ বা আন্তরিকতার গুণ দ্বারা একে আবৃত করা।

৩. রিয়া [দর্শনেচ্ছু]

মানুষের নিকট নফস তার উন্নত গুণাবলী প্রদর্শন করে এই বাসনা নিয়ে যে, লোকে তাকে মহৎ বা বড় ভাববে। কিন্তু তার এ প্রদর্শন আল্লাহর নিকট গ্রহণীয় হয় না। অর্থাৎ তার আমল মূলত লোক-দেখানো আমল বৈ নয়। অথচ সকল আমল হতে হবে একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টিকল্পে।

মানুষ সুনাম অর্জন করতে যেয়ে জান-মালের কুরবানী করে। কিন্তু এ কুরবানী আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য হবে না। সুনাম, যশ, খ্যাতি ইত্যাদি লাভের আশায় মানুষ অনেক ভালো কাজ করে। কিন্তু যেহেতু এগুলো মূলত নিজের নফসকে খুশি করার জন্য হয়ে তাকে তাই এর কোনো মূল্য নেই আল্লাহ তা'আলার দরবারে। অপরদিকে মানুষের নিকট তিরস্কারযোগ্য অনেক আমল যথা: ফকর [ফকিরী], [আল্লাহর ইচ্ছার ওপর] আত্মসমর্পণ, বিনয় ইত্যাদি আল্লাহর নিকট খুবই প্রশংসনীয় আমল।

এই মারাত্মক ব্যাধি থেকে মুক্তির উপায় হলো জাগতিক যশ-খ্যাতি যে বাস্তবে মূল্যহীন তা অনুধাবন করা। হযরত জুনাইদ ও আবু বকর ওয়াররাক রাহমাতুল্লাহি আলাইহিমা এ কথাই বলেছেন। নফস হচ্ছে একটি মুনাফিক, একে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করলে তার মধ্যে লুকানো উত্তম গুণাবলী [আলো] বেরিয়ে আসে। সে তখন তার মধ্যস্থ খারাপ গুণকে গোপন করে দেয় [জ্বলে যায়]। তবে যদিও নফস সৌন্দর্যকে উন্মুক্ত ও কদর্যকে গোপন করে- কিন্তু যাদের দৃষ্টি কলুষিত তাদের নিকট এটা গোপন হয় না। নফস একটি কুৎসিৎ বুড়ির মতো যে নিজের চেহারাকে সাজিয়ে গুজিয়ে তার প্রতি যুবকদের আকর্ষণ সৃষ্টি করতে চায়। অপরিপক্ক যুবকরা এ প্রতারণার শিকার হলেও অধিক জ্ঞানবানদের নিকট এই প্রতারণার প্রতি ঘৃণা বৃদ্ধি পায়।

৪. ক্ষমতালিপ্সা

নফস সর্বদাই কামনা করে, মানুষ তার প্রশংসা করুন। তার নির্দেশনা মেনে চলুক। তাকে সর্বোচ্চ ভালোবাসার পাত্র হিসেবে গ্রহণ করুন। তাকে ভয় করুক ও তার দয়ার উপর নির্ভরশীল হোক। আল্লাহ তা'আলার নিকট এরূপ ইচ্ছা অপছন্দনীয় এবং এগুলোকে পরিহার করার নির্দেশ দিয়েছেন।

ক্ষমতালিপ্সা পরিহার করার পথ হলো, আল্লাহর ক্ষমতা গুণাবলীর অসীমতা ও মাহাত্য সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করা।

৫. আত্মগরিমা

নফস যখন তার সৌন্দর্যমণ্ডিত গুণাবলীর দিকে তাকায়, তখন সে নিজের হালের ব্যাপারে পরিতৃপ্তি অনুভব করে। এ থেকে ঘৃণ্য একটি অবস্থার সৃষ্টি হয়- সে নিজেকে গৌরবময় হিসাবে দেখতে পায়। ক্রমে সে ভুলে যায় যে, সে তো এক নগণ্য বান্দা বৈ নয়। সে আনুত্যশীল ইবাদতকে ধীরে ধীরে উপেক্ষা করতে থাকে। এরূপ আত্মগরিমাসম্পন্ন নফসের ওপর সত্যিকার উপকারী কিছু পতিত হলে সে একে ঘৃণা করে ও ভুলে যায়। এটা একটি মারাত্মক পাপ ও রোগ। এ সম্পর্কে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন।

একামাত্র আত্মসমালোচনা ছাড়া এই রোগ থেকে মুক্তি পাওয়া বড়ো কঠিন।

৬. ধনলিপ্সা ও কৃপণতা

নফস যাকিছু ব্যক্তিগত সম্পদ ও আকাঙ্ক্ষিত বস্তুসামগ্রী জমা করেছে তা সে হারাতে চায়না এবং ভবিষ্যতে হারিয়ে গরীব হয়ে যাওয়ার ভয়ে আতঙ্কিত থাকে। এই গুণটি যখন শক্তিশালী হয়ে ওঠে তখন তার মধ্যে সৃষ্টি হয় হিংসা। আর হিংসা থেকে সৃষ্টি হয় বখিলতা। সৃষ্টি হয় অপরের সম্পদের প্রতি লিপ্সা। অপরের প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ পতিত হয়েছে দেখলে, সে জ্বলতে থাকে।

ধনলিপ্সা ও কৃপণতা দূর হতে পারে ইয়াকীনের নূরের ক্ষমতা দ্বারা।

৭. লোভ ও অতিবেশি পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা

নফস কখনও দীর্ঘমেয়াদী আনন্দবোধে সন্তুষ্ট নয়। নিজেকে সীমাবদ্ধতার মধ্যে রাখতে পছন্দ করে না। এর প্রয়োজনের পেট কখনও ভর্তি হয় না। এটা সেই পতঙ্গের মতো যেটা মোমবাতির আলো দ্বারা সন্তুষ্ট নয়। আলোর সূত্র অগ্নির প্রচণ্ড উত্তাপ তাকে দারুনভাবে আহত করতে পারে জেনেও সে উপদেশ গ্রহণ করে না। অবশেষে তার লোভ তাকে অগ্নির মধ্যে ফেলে জ্বালিয়ে ভষ্মিভূত করে।

অনুরূপ- নফসও যখন বিপদাপদের মধ্যে পতিত হয়, তার লোভের মাত্রা আরো বৃদ্ধি পায়।

নফসের এই রোগ থেকে মুক্তির উপায় হচ্ছে ওয়ারা [কৃচ্ছ্রসাধনা - কষ্ট সহ্য করেও আল্লাহর আনুগত্য লাভের সাধনা] ও তাক্বওয়া [পরহেজগারী] অবলম্বন।

৮. চপলতা ও হঠকারিতা

নফস কোনোকিছুর ওপরই শান্ত নয়। যখন যৌনাকাঙ্ক্ষা এবং বাসনার চিন্তা আসে সে এ ব্যাপারে ধীরতা কিংবা অপেক্ষা করে না। সে সাথে সাথেই এগুলো পূরণের চেষ্টায় লেগে যায়। সে অপেক্ষা করতে চায় না। এসব [ক্ষতিকর] কার্যাদি দ্রুত কার্যকর করতে তৎপর হয়ে ওঠে।

একমাত্র সবর অবলম্বনের মাধ্যমে এই রোগ থেকে মুক্তি পাওয়া যেতে পারে।

৯. দ্রুত ক্লান্তি

নফসের নিকট ক্লান্তিবোধ খুব তাড়াতাড়ি আত্মপ্রকাশ করে৷ তার মধ্যে জন্ম নেয় ভুল ধারণা যে, তাকে বর্তমান ভালো অবস্থা থেকে খারাপ অবস্থায় পতিত করা হয়েছে৷

এরূপ ধারণা থেকে মুক্তির একমাত্র পথ হচ্ছে সর্বাবস্থায় আল্লাহর শুকুর আদায় করা৷

১০. অবহেলা

নফস যেরূপ নিজের ইচ্ছাপূরণে তাড়াহুড়ো করে, ঠিক তদ্রূপ ভালো আমল ও আনুগত্যে অবহেলা ও অলসতা দেখায়৷

এই রোগ থেকে মুক্তির উপায় হচ্ছে কঠোর কৃচ্ছ্রসাধনা ও চেষ্টা৷

নফসের উপরোক্ত প্রতিটি দোষণীয় গুণের আরো বেশ কিছু শাখা-প্রশাখা আছে৷ তবে সকল মূল ও শাখা-প্রশাখার মূল হলো নফস সৃষ্টির উপাদান চতুষ্টয়৷

যথা: ১. গরম, ২. ঠাণ্ডা, ৩. ভেজা ও ৪. শুষ্কতা৷

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

মা'রিফাতে রূহ [আত্মা সম্পর্কে গভীর জ্ঞান]

রূহের মা'রিফাত বা পরিচিতি ও এর রাজকীয় ক্ষমতা সম্পর্কে বুঝা অতি সুকঠিন ও দুর্গম ব্যাপার। যুক্তির নিরিখে একে প্রমাণ করাও দুষ্কর। এটা সেই সিমোর্গের মতো যার বাসা আছে রাজকীয় কাফ পর্বতে। যখনই বুঝার শিকার এতে প্রবেশ করে লেখার বাসস্থান তখনই বিলুপ্ত হয়।

এটা [রূহ] হচ্ছে মহারত্ন যা মহিমার মহাসাগরের তলদেশ থেকে উত্থিত হয়েছে। অনুমানের মাত্রা দ্বারা এর গুণাগুণের বর্ণনা সম্ভব নয়। কাশফের অধিকারী ও হৃদয়ের নিয়ন্ত্রক মহাত্মনগণ [যারা হচ্ছেন গোপন রহস্যের সর্দার, যারা মুক্ত হয়েছেন নফসের যাবতীয় আকাঙ্ক্ষা অনুসরণ থেকে] সামান্য ইশারা ইঙ্গিত ছাড়া রূহ সম্পর্কে ব্যাখ্যা দিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেছেন।

আল্লাহ তা'আলার প্রথম খলিফা ও নবী হযরত আদম আলাইহিস্সালাম, প্রভুর ব্যাখ্যাদাতা, মানবজাতির আদি কারণ, আবিষ্কারের মূল বাঁশি এবং রূহসমূহের বাগান- সকলেই রূহের গুণাগুণ প্রকাশ করেছে। অস্তিত্বের জালে আটকা-পড়া প্রথম শিকার হচ্ছে রূহ।

তাঁর [আল্লাহর] নিজস্ব খিলাফত সৃষ্ট জগতে প্রতিষ্ঠা করার ইচ্ছা করেছেন। রহস্যের গুপ্তধনসমূহের চাবিকাঠি এতে আমানত হিসাবে রেখেছেন। একে রহিত করেছেন জগতে আন্দোলন সৃষ্টি থেকে। এতে খুলে দিয়েছেন জীবন-সায়র থেকে এক বিরাট নদী- যাতেকরে এ থেকে সর্বদা এটা জীবনের অনুগ্রহ আহরণ করতে সক্ষম হয়। এতে সহায়তা করতে পারে বিশ্বের বিভিন্ন অংশে। যাতে প্রচার-প্রসারিত হতে পারে পবিত্র বাক্যাবলী চিরন্তন অস্তিত্ব থেকে বিচ্ছিন্নতার জগতে।

(জগৎ) যাতে ফিরে দিতে পারে সংক্ষেপিত নির্যাস, দিতে পারে নির্যাসের বিভাগে মর্যাদা। এতে [রূহের মধ্যে] আল্লাহ তা'আলা দু'টি ঐশি অনুগ্রহের দৃষ্টি দিয়েছেন:

ক. কুদরতের রাজকীয়তা দর্শনের জন্য একটি।

খ. হিকমাতের সৌন্দর্য দর্শনের জন্য অপরটি।

প্রথম দৃষ্টি প্রাকৃতিক যৌক্তিকতার সঙ্গে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। এর ফলাফল হলো আল্লাহর জন্য ভালোবাসা।

দ্বিতীয় দৃষ্টি যুক্তি, স্বাভাবিকতা ও নীচতার সঙ্গে সম্পৃক্ত। এর ফলাফল পরিপূর্ণরূপে নফস।

সক্রিয় আমল, অক্রিয় আমল এবং ক্ষমতায় নারী ও পুরুষের মধ্যে পার্থক্য বিদ্যমান।

বৃদ্ধিশীল রূহ এবং সর্বজনীন নফসের মধ্যে যৌন-সম্পর্কের কৃষ্টি প্রচলিত হয়েছে প্রকৃতিগত সূত্রে। বৈবাহিক সম্পর্কের মাধ্যমে পৃথিবীর বিভিন্ন জাতি অস্তিত্ব লাভ করেছে। শক্ত ধাত্রীর মাধ্যমে ঈমানী শক্তি আত্মপ্রকাশ করেছে জগতব্যাপী। সুতরাং সকল সৃষ্ট প্রাণী হলো নফস ও রূহের সম্পর্কের কারণ।

রূহের ফলাফল হচ্ছে নফস। রূহ হচ্ছে নির্দেশ। কারণ তাঁর [আল্লাহর] স্ব-ইচ্ছায় কোনো কার্যকারণ ছাড়াই আল্লাহ রূহকে (নির্দেশের মাধ্যমে) সৃষ্টি করেছেন। আর রূহ দ্বারাই সৃষ্টি করেছেন সকল সৃষ্ট প্রাণী।

আল্লাহর খলিফাদের সবাইকেই যেহেতু বিভিন্ন গুণাবলীর ধারক-বাহক হওয়া প্রয়োজন, তাই আল্লাহ রূহকে সৃষ্টির খিলাফতে বস্ত্রাবৃত করেছেন অসংখ্য অনুগ্রহ ও গুণাবলী দ্বারা। তিনি আবৃত করেছেন তাকে সকল উত্তম নামের মর্যাদার-

পোশাক দ্বারা। তাকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করেছেন নিজের সৌন্দর্য ও মহিমা দ্বারা। একে বানিয়েছেন সৃষ্টির মধ্যে সেরা।

সৃষ্টিচক্র যখন সুসম্পন্ন হলো, ধূলোয়মাখা অস্তিত্বশীল আদমের আয়নায় প্রতিবিম্ব হয়ে প্রকাশ পেলো রূহ। এরই মধ্যে উজ্জ্বল হয়ে ওঠলো সুন্দর নাম ও গুণাবলীসমূহ। উন্নত স্থানসমূহে বিস্তৃত হয়ে পড়লো আদমের খিলাফতের সংবাদ। তাঁর খিলাফতের রাজকীয় সীল মোহর অঙ্কিত হলো। আদমের ওপর আল্লাহর অনুগ্রহের প্রমাণ বর্ণিত হলো কুরআনের এই আয়াতে: "আমি আদমকে সকল নাম শিক্ষা দিলাম।" [১১:৩১]

তাঁর উপলব্ধির কব্জায় উপস্থিত করা হলো নিয়ন্ত্রণের তোরণ এবং হুকুমের চোখ। তাঁর প্রতি ভক্তির জন্য ফিরিশতাদের নির্দেশ দেওয়া হলো।

কিছু ফিরিশতাদের গুণাবলী হলো:

ক. শুধু জামালী [সৌন্দর্যমণ্ডিত -নরমদিলের]। তারাই হচ্ছেন দয়া, অনুগ্রহের ফিরিশতা।

খ. শুধু জালালী [গরমদিলের]। তারাই হচ্ছেন রাগ, দয়া এবং প্রতিশোধ গ্রহণের ফিরিশতা।

হযরত আদম আলাইহিস্সালাম আল্লাহকে তাঁর [শেখানো] সকল নামের মাধ্যমে জেনেছেন। অপরদিকে ফিরিশতারা আল্লাহকে জেনেছেন যে নাম তাদের শেখানো হয়েছে শুধু সেটি দ্বারা।

বস্তুজগতে:

ক. আদমের অস্তিত্ব হলো গোপন জগতের রূহের স্তর।

খ. হাওয়ার অস্তিত্ব হলো গোপন জগতে নফসের স্তর।

আদম থেকে হাওয়ার জন্ম রূহ থেকে নফসের জন্মের মতো। রূহ ও নফসের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক এবং পুরুষ ও নারীর মধ্যে আকর্ষণ আদম ও হাওয়ার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হলো।

রূহ ও নফসের মধ্য থেকে অস্তিত্বে আসলো সন্তান-জন্মানোর জৈবিক উপাদান (যা আদমের মেরুদণ্ডে সংরক্ষিত হলো) যা ছিলো আদম-হাওয়ার মিলনের ফলাফল। আদম ও হাওয়ার অস্তিত্ব হয়ে ওঠলো রূহ ও নফসের অস্তিত্বের আদর্শস্বরূপ। আর জগতের প্রত্যেক লোকের মধ্যে আরেক আদর্শস্বরূপ অস্তিত্ব লাভ করলো রূহ ও নফসের একত্রীকরণ। আর এটা প্রতিস্থাপিত হয়েছে আদি মানব-মানবী আদম ও হাওয়ার আদর্শ থেকে।

এ থেকেই জন্ম নিয়েছে:

ক. হৃদযন্ত্র - নফস ও রূহের উপাদানসহ।
খ. পুরুষের আকৃতিতে আদমের সন্তানাদি- সর্বজনীন রূহের আকারে।
গ. নারীর আকৃতিতে আদমের সন্তানাদি - সর্বজনীন নফসের আকারে।

নারীর আকৃতিতে কোনো নবী প্রেরিত হন নি। মানবের মধ্যে রূহের আন্দোলন ও সৃষ্টির সঙ্গে এর সম্পর্কের কারণে নবীওয়ালা গুণাবলী শুধুমাত্র পুরুষের মধ্যে বিদ্যমান। নবীদের রহস্যাবলী প্রকাশের ক্ষেত্র হচ্ছে উপযুক্ত রূহ ও দেহ যা পুরুষের স্বভাবজাত গুণ। [এর অর্থ নয় যে, নারীদের মর্যাদা ক্ষুণ্ন হয়েছে- বরং নবীওয়ালা গুণাবলী নারীদের মধ্যে বিদ্যমান নেই।]

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

জামা' [একত্রীকরণ] ও তাফরাকা [বিচ্ছুরণ]

তাসাওউফের পরিভাষায় জামা' অর্থ:

ক. কাঠামো [সৃষ্টি] বিতাড়ন [অস্বীকৃতি]।

খ. সংজোযন [দুনিয়াবী সুযোগ-সুবিধা] বর্জন।

গ. সৃষ্টি থেকে শুহুদে হক্ক ওঠানো।

তাফরাকা অর্থ:

ক. কাঠামো [সৃষ্টি] গ্রহণ [স্বীকৃতি]।

খ. আল্লাহর আনুগত্য নিশ্চিতকরণ।

গ. আল্লাহকে সৃষ্টজগৎ থেকে আলাদাকরণ।

তাফরাকা ছাড়া জামা' হচ্ছে অধার্মিকতা। জামা' ছাড়া তাফরাকা অকার্যকর। তাফরাকাসহ জামা' হচ্ছে সর্বাধিক সত্য। কারণ এতে আছে রূহের সঙ্গে জামা'র এবং তাফরাকার সঙ্গে আকারের মিলনের নির্দেশ। যতক্ষণ রূহ ও দেহের মধ্যে সম্পর্ক বিদ্যমান থাকবে, ততক্ষণ জামা' ও তাফরাকার একত্রীকরণ অস্তিত্ব রক্ষার জন্য শর্ত।

সত্যিকার আ'রিফ সর্বদাই একত্রিত আছেন:

ক. [মুশাহিদার ক্ষেত্রে] রূহের সঙ্গে জামা'র নির্যাসে।

খ. [দ্বন্দ্বের কারণ] দেহের সঙ্গে তাফরাকার মাক্বামে।

এ কথাগুলো বলেছেন হযরত জুনাইদ বাগদাদী ও হযরত ওয়াসিতী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিমা। সুফিরা এ স্তরকে '**জামা'উল জামা'**' বলেন।

গভীর অনুরক্তির মাধ্যমে যারা দৃষ্টিপাত করেন:

ক. নিজের অর্জনের প্রতি, তিনি আছেন তাফরাকায়।

খ. আল্লাহর অনুগ্রহের প্রতি, তিনি আছেন জামা'য়।

গ. নিজের দিকে কিংবা নিজের আমলের দিকেও নয়, তিনি আছেন জামা'উল জামা'য় (সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্তাবস্থা)।

এ কথাগুলো বলেছেন হযরত আবু আলী দাক্কাক ও হযরত জুনাইদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহিমা।

জামা'র বৈশিষ্ট্য হলো, জুহুর ও শুহুদে হাক্ক [আল্লাহর প্রকাশ ও স্পষ্টকরণ] এর অবস্থা যা মানুষ ও জগত থেকে পর্দাবৃত রখে।

তাফরাকার বৈশিষ্ট্য হলো, শুহুদে উজুদে খালক [সৃষ্টির অস্বিত্বের প্রকাশ] এর অবস্থা যা আল্লাহ তা'আলাকে পর্দার আড়ালে রাখে।

উনবিংশ পরিচ্ছেদ

তাজাল্লি [নূরে হাক্বিক্বাতের প্রকাশ] ও ইস্তিতার [লুকানোবস্থা]

তাজাল্লি হলো: আল্লাহর হাক্বিক্বাতের সূর্য মানব মেঘমালা থেকে বের হওয়া ও প্রকাশ।

ইস্তিতার হলো: মানবিক গুণাগুণের মধ্যে হাক্বিক্বাতের আলোর মেঘমালার প্রকাশ।

তাজাল্লি তিন ধরনের:

১. তাজাল্লিয়ে জাত

এটার নিদর্শন হলো [যদি পবিত্র রাস্তার পথিকের অস্তিত্বের কিছুটা অবশিষ্ট থেকে থাকে] জাতের ফানা। নিজের গুণাগুণ এই নূরের মধ্যে বিলীন হয়ে যাওয়া। সুফিরা এই অবস্থাকে '**মূর্ছিত হওয়া**' বলে থাকেন। এটাই ছিলো হযরত মূসা আলাইহিস্সালামের অবস্থা, যিনি তাজাল্লির মধ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেলেন। তিনি আল্লাহর জাতকে অবলোকনের আবদার করেন। কিন্তু তিনি তখনও ফানার স্তরের পরে বাকার স্তরে পৌঁছুন নি। তুর পাহাড়ে জাতের তাজাল্লি প্রকাশের সময় তিনি উপস্থিত থাকলেও নিজের গুণাগুণ ও নফসকে সম্পূর্ণ বিলীন করেছিলেন- আর এটাই এই অবস্থার স্বভাবিকতা।

তাঁর অস্তিত্বের অবশিষ্টাংশ থেকে ফানা যদি সম্পূর্ণরূপে আলাদা থাকতো এবং অস্তিত্ব থেকে ফানা শেষে এর হাক্বিক্বাত পরিপূর্ণ বাকার সঙ্গে একত্রিত হতো, তাহলে তিনি চিরন্তন নূরের মাধ্যমে চিরন্তন জাতকে দেখতে পেতেন। এই মর্যাদার পোশাকে ভূষিত করা হয়েছে আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে। তাঁকে দান করা হয়েছে চিরন্তন তাজাল্লির সূরার

পাত্র, যা থেকে তিনি গ্রহণ করেছেন একচুমুক স্বাদ। আর এই পানপাত্র থেকে আসে তাঁর অনুসারী বিশিষ্টজনদের মুখগহ্বরে একটুকু পানীয়। সুতরাং ওলির স্থান কখনও নবীর উপরে হবে না। কারণ, ওলি এ স্তরে উন্নীত হন নিজের মনগড়া আমল দ্বারা নয়, বরং নবীর সুন্নাতের একান্ত অনুসারী হয়ে।

২. তাজাল্লিয়ে সিফাত

অস্তিত্বের আদি অবস্থায় তাজাল্লি বিকশিত হয়েছে:

ক. জালালের মাধ্যমে। সে আছে [আল্লাহর মহিমা, কুদরত ও ক্ষমতা হেতু] খুজু [আন্তরিক বিনয়] ও খুশুর [দৈহিক বিনয়াভাব] মধ্যে।
খ. জামালের মধ্যে। সে আছে [আল্লাহর দয়া, সৌন্দর্য ও অনুগ্রহ হেতু] হর্ষোৎফুল্ল ও প্রেমাসক্ত অবস্থায়।

চিরন্তনের জাত পরিবর্তন হয় না। তবে জরুরত হেতু, ধারণশক্তির বৈপরীত্য কোনো কোনো সময় বাইরদিকে জালাল ও ভেতরদিকে জামাল প্রকাশ হয়ে থাকে।

৩. তাজাল্লিয়ে আফআ'ল

এটার বৈশিষ্ট্য হলো:

অপরের আমলের ওপর নিজের পলককে পতিত করা থেকে এড়িয়ে থাকা। অপরদের মধ্যে আছে ভালো এবং মন্দ আমল যুক্ত করার ব্যাপারে বিঘ্ন সৃষ্টি, লাভ ও ক্ষতির চিন্তা, নিজেদের প্রশংসা ও দোষক্রটি পরিমিতকরণ এবং তাদের গ্রহণ ও পিরত্যাগ করা। কারণ ঐশি আমলের মুক্ত প্রকাশ আমল বাড়ানোর মানুষ থেকে নিজে নিজেই খারিজ হয়ে যায়।

পবিত্র তরীকতের রাস্তায় ভ্রমণকারীর জন্য ভ্রমণের স্তর উপস্থিত হয় নিম্নোল্লিখিত তরতীব অনুযায়ী:

১. তাজাল্লিয়ে আফআ’ল।
২. তাজাল্লিয়ে সিফাত।
৩. তাজাল্লিয়ে জাত।

আমল হচ্ছে গুণগত মানের ফলাফল। আর জাতের মধ্যে জড়িয়ে আছে গুণাগুণ। মানুষের জন্য আমলসমূহ গুণগত মান থেকে নিটবর্তী। আর গুণাগুণ হচ্ছে জাত থেকে নিকটবর্তী।

তারা উক্ত তিন ধরনের তাজাল্লির সঙ্গে হালত্রয়ের নামকরণ করেছেন:

ক. শুহুদে তাজাল্লিয়ে আফ’আল [আমলের মহিমার প্রকাশ] হলো, মুহাজিরা [উপস্থিত]।
খ. শুহুদে তাজাল্লিয়ে সিফাত [গুণাগুণের মহিমার প্রকাশ] হলো, মুকাশিফা [প্রকাশ]।
গ. শুহুদে তাজাল্লিয়ে জাত [জাতের মহিমার প্রকাশ] হলো, মুশাহিদা [দর্শন]।

তারা উক্ত তিন হালের [আধ্যাত্মিক অবস্থার] নামকরণ করেছেন:

১. মুহাজিরা - হৃদয়ের হাল।
২. মুকাশিফা - রহস্যের হাল।
৩. মুশাহিদা - রূহের হাল।

ব্যক্তি যিনি দণ্ডায়মান স্বাক্ষ্যকৃতের অস্তিত্বের [আল্লাহর] সামনে, তাঁর থেকে সত্যিকার মুশাহিদার বিকাশ- নিজের থেকে নয়। কারণ চিরন্তনের নূরের ক্ষমতার মহিমা কোনো দুর্ঘটনা [হাদিস] নয়। যতক্ষণ পর্যন্ত দর্শন অবস্থায় থাকবে ততক্ষণ শাহিদ [দর্শনকারী] বিলুপ্ত হবে না।

মজনু [উন্মাদ] অবস্থায় বিচ্ছেদের আগুন ও মিলনাকাঙ্ক্ষার প্রাবল্য নিজের মধ্যে ক্রিয়াশীল হওয়ার পর, মজনুদের একটি দল লায়লার দলের সাথে মধ্যস্থতা করে এবং প্রশ্ন তুলে:
"*কী হতো বলো, মুহূর্তের জন্য যদি মজনুর আঁখিদ্বয় নূরের আভায় ভেসে যায় লায়লার সৌন্দর্য দর্শনে?*"

লায়লার দল জবাব দেয়:
"*এটুকুতে তো কোনো ক্ষতি নেই। কিন্তু মজনুর চোখ যে লায়লার নূরকে ধরে রাখতে অপারগ।*"

এরপরও অবশেষে তারা নিয়ে আসলো মনজুকে। উত্তোলন করলো লায়লার তাঁবুর একটি কোণ। সাথে সাথে মজনুর দৃষ্টি পতিত হলো লায়লার পরনের ঘাঁগরির ভাঁজে। অজ্ঞান হয়ে পড়লো মজনু।

সংক্ষেপে, আল্লাহর মহিমা হচ্ছে মানুষ পর্দাবৃত থাকার কারণ। আর তিনি পর্দার আড়ালে থাকার কারণ হলো মানুষের [মহিমার] প্রকাশ।

যখন আল্লাহ তা'আলা মহিমান্বিত হন:

ক. তাঁর নিজের কর্মের মধ্যে, তাতে মানুষের কর্ম পর্দাবৃত হয়ে যায়।

খ. তাঁর জাতের মধ্যে, তাতে মানুষের জাত, গুণাগুণ ও কর্ম পর্দাবৃত হয়ে যায়।

হিকমাত জগতে দেখভাল এবং তাঁর বিশেষ বান্দাদের ওপর অনুগ্রহের মাত্রা প্রশস্ত করতে, অসীম প্রজ্ঞাময় একক [আল্লাহ] আকাঙ্ক্ষার গুণাবলীর অবশিষ্টাংশ রেখে দেন, যাতেকরে তাদের ও অপরদের ওপর করুণা বর্ষিত হয়।

তাঁদের [বিশেষ বান্দাদের] জন্য: লোভ-লালসার পেশায় তারা অধ্যবসায়ে থাকতে পারেন এবং স্থায়িত্বের দ্বারা লাভ করতে পারেন আল্লাহর নৈকট্য।

অন্যান্যদের [আম জনতার] জন্য: ফানার নির্যাসে বিলুপ্ত এবং জামা'র সাগরে নিমজ্জিত হওয়া সম্ভব নয়। ফলে অপরদের জন্য এদের অস্তিত্ব হয়ে যেতে পারে মুনাফার সূত্র।

কিছু সুফি উলামায়ে কিরাম বলেছেন:
মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়সাল্লামের পক্ষ থেকে ইস্তিগফার হচ্ছে উক্ত পর্দার জন্য যাচ্ঞা। যাতেকরে তিনি শুহুদের সাগরে নিমজ্জিত না হন। তাঁর মাধ্যমে যাতে সমগ্র মানবজাতি উপকৃত হয়।

বিংশ পরিচ্ছেদ

ওয়াজদ [পরমমগ্নতা] এবং উজূদ [অস্তিত্ব]

ওয়াজদ এর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে:

ক. স্বয়ং আল্লাহর পক্ষ থেকে কোনো ঘটনা আসা এবং হৃদয় তার নিজের আকার থেকে বিরাট দুঃখ কিংবা বিরাট আনন্দে পরিবর্তিত হওয়া।

খ. এমন এক অবস্থা যখন (অস্থায়ী) মানবিক গুণাগুণ রহিত হয়ে যায় এবং ব্যক্তির স্বভাব পরিণত হয় মহানন্দে।

ওয়াজিদ (ওয়াজদ এর অধিকারী) এর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে:

এমন এক ব্যক্তি যে নিজের ইন্দ্রিয়জণিত গুণাগুণের পর্দা থেকে তখনও বের হয় নি। নিজের অস্তিত্ব দ্বারা পর্দাবৃহ হয়ে আছে আল্লাহর অস্তিত্ব থেকে। তবে কেনো কোনো সময় তার অস্তিত্বের পর্দায় মৃদু ফাঁক সৃষ্টি হয়। এ সময় আল্লাহর অস্তিত্বের নূরের ঔজ্জ্বল্যতা ঝলঝল করে ওঠে। এরপর পর্দায় ভাঁজ পড়ে এবং মাওজুদ [অস্তিত্ব] হারিয়ে যায়।

ওয়াজদ হলো পূর্বেকার হারানোবস্থা ও পরবর্তী হারানোবস্থার মধ্যবর্তী অবস্থা।

উজূদ এর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে:

ক. মাওজূদের শুহুদ [আল্লাহর অস্তিত্ব] এর আলোর শ্রেষ্ঠত্ব হেতু উজূদ ও ওয়াজিদ হারিয়ে যায় ও শূন্যতে পরিণত হয়।

খ. এতে আছে মুহদাত [দুর্ঘটনার] গুণাগুণ।

গ. কাদিম [আদি একক সত্তা - আল্লাহ] এর গুণাগুণের অস্তিত্ব।

হযরত যুননুন মিসরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন: যখন নিজের অস্তিত্বের মধ্যে ওয়াজদ এর অধিকারী ব্যক্তি বিলুপ্ত হয় নি- সে হচ্ছে ওয়াজিদ। তার মধ্যে অবস্থান করছে ওয়াজদ।

যখন নিজের অস্তিত্বের মধ্যে ওয়াজদ এর অধিকারী ব্যক্তি সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয়েছে- এবং মাওজুদের অস্তিত্বের মাঝে দাঁড়ানো আছে- সে হচ্ছে মাওজুদের জাত [আল্লাহর অস্তিত্বের অস্তিত্ব], তবে ওয়াজিদের জাত নয়।

ওয়াজিদ এর নিদর্শন হচ্ছে: সে নিজের অস্তিত্বের বিলুপ্তকারক। তাই শিবলী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন: যে তার নিজের ওয়াজদ এর প্রকাশ হেতু মাওজুদের ওয়াজদ [আল্লাহর অস্তিত্ব] দর্শন থেকে পর্দাবৃত হয়েছে, তার মধ্যে এসেছে পরমানন্দ। আর যে মাওজুদের ওয়াজদ দর্শন হেতু বঞ্চিত হয়েছে নিজের ওয়াজদ এর প্রকাশ থেকে- তার মধ্য থেকে পরমানন্দের সম্ভাবনা বিদায় নিয়েছে। ওয়াজদ এর শেষ হচ্ছে উজূদের শুরু। অর্থাৎ ওয়াজদ এর উজূদ হচ্ছে ওয়াজিদ অস্তিত্ব থেকে বঞ্চিত হওয়ার কারণ। আর এই অবস্থা হলো মাওজুদের উজূদ [আল্লাহর অস্তিত্বের অস্তিত্ব]।

নিচের কথাগুলো বলেছেন: ক. হযরত আবুল হাসান নূরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ও খ. হযরত আবু বকর শিবলী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি।

"*নিজের থেকে ওয়াজদ এর সংযুক্তি কেড়ে নেওয়া হচ্ছে তাওহীদকে গ্রহণ করার নির্যাস। আর নিজের মধ্যে একে যুক্ত করা হচ্ছে [তাওহীদের] অস্বীকৃতির নির্যাস।*"

হযরত বায়িজিদ বিস্তামী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেছেন: "*ওয়াজদ যেমন উজূদের শুরু, তেমনি তাওয়াজুদ [ওয়াজদ-তৈরি] হলো ওয়াজদ এর শুরু।*"

তাওয়াজুদের বৈশিষ্ট্য হলো: ওয়াজদ এর কামনা ও আকর্ষণ সৃষ্টি হয়:

ক. তাজাক্কুর [বার বার বলা],

খ. তাফাক্কুর [চিন্তাভাবনা] এবং

গ. ওয়াজদ এর অধিকারী ব্যক্তির আন্তরিক অনুসরণ এর মাধ্যমে।

বাহ্যিকভাবে তাওয়াজুদ প্রস্তুতিপর্ব ও এটা আন্তরিকতার বিপরীত বলে মনে হয়। অথচ মুতাওয়াজিদ এর সিদ্ধান্ত যেহেতু, তাওয়াজুদের এ অবস্থা সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল ঐশী উদারতার প্রতি এবং এটা ঐশী অনুগ্রহ লাভের আশায় সত্যিকার নিবেদন, তাই একে আন্তরিকতার বিপরীত কর্ম বলা যাবে না। শরীয়তে তাই এর অনুমতি ও নির্দেশনা বিদ্যমান।

মানবের ব্যাখ্যা হলো:

ক. শুরুতে তাওয়াজুদ।

খ. রাস্তায় ওয়াজদ।

গ. অর্জনে উজূদ।

একুশতম পরিচ্ছেদ

ওয়াক্ত [নির্দিষ্ট কাল] ও নাফাস [মুহূর্ত]

সুফিয়ায়ে কিরাম ‘ওয়াক্ত’ শব্দটির তিনটি অর্থ আছে বলেছেন:

১. ওয়াক্তের প্রথম অর্থ হতে পারে, একটি গুণ যেমন ‘কব্জ’ (সংকোচন), ‘বাস্ত’ (প্রশস্তকরণ), দুঃখ ও আনন্দ। এগুলো সালিকের মধ্যে বিভিন্ন অবস্থায় বিরাজমান থাকতে পারে। অতিক্রান্ত হালের উত্তমতা থেকে এরূপ ওয়াক্তের অধিকারী সালিক অপর কোনো হালের স্বরূপ বুঝাতে পারে না।

সুতরাং কেউ যদি কব্জ এর হালের অধিকারী হয়- হালের উত্তমতা দ্বারা তার মধ্যে এতো বেশি ছাপ পড়ে যে, সে অতীতের ‘বাস্ত’ কিংবা ভবিষ্যতে আগত ‘বাস্ত’ এর কোনো চিহ্ন দেখতে পায় না [সে মনে করে একমাত্র হাল বর্তমান কব্জ ছাড়া আর কিছু নেই]। তার সার্বক্ষণিক দৃশ্যে শুধুমাত্র ‘ওয়াক্তে হাল’ এর অবস্থা ভেসে থাকে। অপরের হালের উপরে নিজেরটা আন্দোলিত হতে দেখে, ফলে এটাই ভুলের সূত্রে পরিণত হয়।

প্রত্যেক হাল তার নিজেরটার সঙ্গে সামঞ্জস্যশীল থাকে, সে এভাবে হালের সত্যাসত্য সম্পর্কে শর্তারোপ করে। বাকি সবকিছু তার নিকট মিথ্যা হিসেবে প্রতিফলিত হয়।

এ ব্যাখ্যার মধ্যে ওয়াক্ত এর সাধারণ ধারণা প্রকাশ পেয়েছে। এ ব্যাখ্যা পবিত্র রাস্তার পথিক সালিকের জন্য যেমন প্রজোয্য ঠিক তেমনি প্রজোয্য যে এ রাস্তায় পাড়ি জমায় নি।

২. ওয়াক্ত এর দ্বিতীয় অর্থ হতে পারে, একটি গুণ। আঘাত দ্বারা এটির উৎপত্তি হতে পারে 'গাইবাত' (বাতিন) থেকে। প্রভাব শক্তিশালী হওয়ায় সালিকের নিজের হালের ওপর এর অগ্রাধিকার সৃষ্টি হয়। সালিক এর নিজস্ব নির্দেশনার প্রতি আত্মসমর্পণ করে। পবিত্র রাস্তার ভ্রমণকারীর জন্য এরূপ ওয়াক্ত একটি বিশেষ অবস্থা। এটা নিচের বাক্যটির প্রতি ইঙ্গিত দেয়:

"***তাঁর সময়ের সন্তান হচ্ছেন সুফি***"।

তারা যখন বলেন, "**ওয়াক্তের অধ্যাদেশ দ্বারা**", তাদের উদ্দেশ্য: আল্লাহর ইচ্ছায়, তার নিজের ইচ্ছা হেতু সে ধরা দিয়েছে এবং পর্দাবৃত হয়েছে।

"**আল্লাহ ছাড়া**" সম্পর্কিত নির্দেশনার ব্যাপার হচ্ছে, যে দেখিয়েছে তৃপ্তি, দ্বন্দ্বে জড়িত হয়েছে এবং এর প্রভাবে বশীভূত।

তাই তারা [সুফিরা] বলেন: "**ওয়াক্ত হচ্ছে কতল করার অসি।**" এই অসির মধ্যে দু'টি গুণ আছে। প্রথমটি হলো নরম ও মসৃণ। দ্বিতীয়টি হলো ধারালো কাটার প্রান্ত। যে কেউ এর প্রতি কোমলতা দেখাবে ও একে নম্রভাবে ঘষবে সে এ থেকে কোমলতা পাবে। অপরদিকে যে কেউ এর প্রতি কাঠিন্যতা দেখাবে সে এর হিংস্রতা হেতু যখমের শিকার হবে। মোটকথা ওয়াক্ত এর মধ্যে দু'টি বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান: **অমায়িকতা ও ক্রোধ।**

যে কেউ এর বৈশিষ্ট্যের প্রতি রাজী ও সামঞ্জস্যশীল সে এর সৌন্দর্য থেকে আনন্দ ভোগ করবে। আর এর থেকে বিকর্ষণ সৃষ্টি ও বিরোধিতা করার অর্থ হলো এর হিংস্রতার শিকার হওয়া।

আল্লাহর ইচ্ছার দ্বারা, ওয়াক্ত হচ্ছে সকল প্রয়োজনের মধ্যে বড়ো। এটাই সাফল্যের মূল। তার নিজের নির্দেশনা মুতাবিক সকল প্রয়োজনকে সাজিয়ে তুলে, ঠিক অসি যেভাবে কর্তনের কাজ করে।

৩. ওয়াক্ত এর তৃতীয় অর্থ হতে পারে, বর্তমান সময়। এটা মধ্যম অবস্থান- অতীত ও ভবিষ্যৎ উভয় দিকে। তারা বলেন: "***অমুক হচ্ছেন ওয়াক্ত এর গুরু***" এর অর্থ, বর্তমানের মধ্যে আবৃত্তির কর্মে জড়িত। একটি বস্তুর জন্য (যা ঐ মুহূর্তে সর্বাধিক উত্তম ও গুরুত্বপূর্ণ) উৎকণ্ঠা হেতু তিনি অতীত সম্পর্কে বলা কিংবা ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবনা থেকে বিরত থাকেন। সুতরাং তার 'সময়' তিনি ক্ষয় করেন না।

এই ওয়াক্ত, পবিত্র ভ্রমণকারীর নিকট হালের তানবীন হেতু কোনো সময় অস্তিত্বশীল কোনো সময় বিলুপ্ত। যারা আল্লাহর সঙ্গে মিলে গেছে ও যারা তামকিনের সাথী, এই ওয়াক্ত তাদের জন্য নিরবচ্ছিন্ন; আর এর প্রতি অস্বীকৃতির রাস্তা বন্ধ হয়ে গেছে।

আবু বকর শিবলী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন:
এই ওয়াক্তের অধিকারী হচ্ছে হালের আন্দোলনের নিচ থেকে উত্থিত নিঃসরণকারী।

দ্বিতীয় অর্থে, ওয়াক্ত তার ওপর শক্তিশালী নয়। না, সে ওয়াক্তে শক্তিশালী ঐ দৃষ্টিতে, সে সকল ওয়াক্ত সক্রিয় রাখে গুরুত্বপূর্ণ কর্মে।

কোনো কোনো সুফি ওয়াক্তের অধিকারীকে 'ওয়াক্তের পিতা' বলেছেন- ওয়াক্তের ছেলে নয়।

নাফাস এর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে:

মুশাহিদা (প্রকাশের) হালের একটি পর্যায়, যেখানে একত্রিত হয়েছে প্রেমিকদের জীবন ও হৃদয়। এটা যেমন শ্বাস-নিঃশ্বাসের পর্যায়, যেখানে সৃষ্টি হয়েছে দেহ-প্রাণের স্থায়িত্বের অবস্থা। একটি মুহূর্তের জন্যও যদি হৃদয়ের রাস্তা থেকে শ্বাসক্রিয়া স্তব্ধ হয়, স্বাভাবিক তাপ হেতু এটা জ্বালাময়ী হয়ে ওঠবে।

ওয়াক্ত ও নাফাসের মধ্যে পার্থক্য হলো এই: নির্জীবতা ও স্তব্ধতার স্থানে ওয়াক্ত একটি হাল। এটা পশ্চাদ্ধাবন, পর্যবেক্ষণ, মুশাহিদা (প্রকাশ) এবং গাইবাত (গোপনীয়তা) ইত্যাদি সম্পর্কিত ঘটনা।

নাফাস একটি হালের নাম যা সর্বদাই নির্জীবতা ও স্তব্ধতা থেকে মুক্ত। এ কারণেই সুফিরা বলেছেন:

"ওয়াক্ত হচ্ছে প্রাথমিক স্তরের পথিকদের জন্য, রাস্তার শেষ প্রান্তে অবস্থানকারীদের জন্য নাফাস।"

বাইশতম পরিচ্ছেদ

শুহুদ [উপস্থিতাবস্থা] ও গায়বাত [অনুপস্থিতাবস্থা]

শুহুদের অর্থ হলো:

বর্তমান থাকা। যা কিছুতেই হৃদয় উপস্থিত থাকে, সে সেটিরই শাহিদ (স্বাক্ষ্যদাতা)। যা সে [হৃদয়] দেখে তাই হচ্ছে হৃদয়ের মাশহুদ (স্বাক্ষ্যকৃত বস্তু)। হৃদয় যদি আল্লাহর সঙ্গে থাকে তাহলে সে আল্লাহর শাহিদ। হৃদয় যদি মানুষের সঙ্গে থাকে তাহলে সে মানুষের শাহিদ।

সুফিদের রাস্তা হচ্ছে:

তারা মাশহুদকে (স্বাক্ষ্যবস্তুকে) শুহুদ (স্বাক্ষ্যদাতা) বলেন। এর কারণ হলো, হৃদয় যাকিছু নিয়ে উপস্থিত আছে, ঐ বস্তুও তো হৃদয় নিয়ে উপস্থিত আছে!

আল্লাহর এককত্তের খাতিরে ও মানুষের বহুত্বের ব্যাপারে তাঁদের ধারণা হলো:

ক. শাহিদ (একবচনে) অর্থ আল্লাহ।

খ. শাওয়াহিদ (বহুবচনে) অর্থ মানুষ।

গ. শুহুদ (একবচনে) অর্থ আল্লাহর মধ্যে উপস্থিত। কারণ তাদের হৃদয় সর্বদাই আল্লাহর শাহিদ [স্বাক্ষ্যদাতা] এবং আল্লাহর সঙ্গে হাজির [উপস্থিত]।

শুহুদ লোকজন দু'টি দলে বিভক্ত:

১. মুরাকাবার দল। [এরা সর্বদা আল্লাহভীতির ধ্যানে মগ্ন]

২. মুশাহিদার দল। [এরা সর্বদা আল্লাহর দর্শনে নিমগ্ন]

শুহুদের বিপরীতে আছে গাইবাত:

১. ত্রুটিপূর্ণ গাইবাত, যা হলো শুহুদে হাক্ব এর বিপরীত।

২. প্রশংসনীয় গাইবাত, যা হলো শুহুদে খাল্ক এর বিপরীত। এটাও [শুহুদের হাক্ব থেকে উত্তম হওয়ার কারণে] দু'প্রকার।

(ক) প্রাথমিক স্তরের সালিকের গাইবাত; অনুভূত বস্তুর গাইবাত।

(খ) মধ্যম স্তরের সালিকের গাইবাত; তার নিজের অস্তিত্বের গাইবাত- এটাই হচ্ছে গাইবাতের সীমানা ও ফানার শুরু।

শেষের স্তরের সালিকদের স্তর গাইবাতের হালের বাইরে। কারণ গাইবাত হচ্ছে ঐ সালিকের হাল যে এখনও অস্তিত্বের সংক্ষীর্ণ স্থান থেকে মুক্ত হতে পারে নি। না এখনও পৌঁছুয়েছে পরোৎকৃষ্ট অস্তিত্বে (আল্লাহ), না সে পেয়েছে গাইবাত (অনুপস্থিতির) ও শাহাদাতের (উপস্থিতির) সীমানা।

ত্রুটিপূর্ণ গাইবাতের অধিকারী ব্যক্তি মানুষের শাহিদ দ্বারা শুহুদে হক্ব থেকে লুকানো আছে। প্রশংসনীয় গাইবাতের অধিকারী ব্যক্তি আল্লাহর শাহিদ দ্বারা শুহুদে খালক থেকে লুকানো আছে।

উৎকৃষ্ট ব্যক্তিদের নিকট, মানুষ থেকে আল্লাহর শুহুদ গোপনীয় নয়- না গোপনীয় আছে মানুষের শুহুদ আল্লাহ থেকে।

পবিত্র রাস্তার সালিক ও তালউইনের অধিকারী ব্যক্তির জন্যই শুহুদের নিয়মকে মানা ও প্রশংসনীয় গাইবাতের অনুসরণ প্রজোয্য।

যারা আল্লাহর একত্বের সঙ্গে মিশে আছেন এবং যারা স্থিতির মধ্যে প্রতিষ্ঠিত তাদের মধ্যে কোনো হাল নেই শুধুমাত্র শুহুদে হক্ব ছাড়া। তাদের জন্য প্রশংসনীয় কিংবা ত্রুটিপূর্ণ কোনো গাইবাত নেই।

একদিন হযরত শিবলী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি হালের অবস্থায় হযরত জুনাইদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহির বাড়িতে গেলেন। কক্ষের ভেতর উপস্থিত ছিলেন হযরত জুনাইদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ও তাঁর স্ত্রী। আগন্তুককে দেখে স্বভাবতই হযরতের স্ত্রী পর্দার আড়ালে যেতে লাগলেন। কিন্তু হযরত জুনাইদ বললেন, "পর্দার প্রয়োজন নেই! শিবলী বর্তমানে গায়েবে অবস্থান করছেন। তুমি তোমার জায়গায় থাকো।" একটু পর হযরত শিবলী কাঁদতে লাগলেন। এবার জুনাইদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি স্ত্রীকে বললেন, "এখন তোমাকে পর্দা করা উচিৎ কারণ, শিবলী পুনরায় জ্ঞান ফিরে পেয়েছেন।"

প্রাথমিক স্তরের ব্যক্তিদের অবস্থা হলো:
প্রেমাস্পদের শুহুদের মধ্যে তাঁরা মানুষ থেকে গাইবাত অবস্থায় থাকেন। এ থেকে শেষের স্তরের ব্যক্তিরা বেরিয়ে এসেছেন।

ইউসুফ আলাইহিসসালামের প্রেমে পড়ে জুলাইখা তামকিনের হাল অনুভব করছিলেন। তাঁর সাথী ও নিন্দাকারীদের মতো, হযরত ইউসুফের শুহুদ নিজের ইন্দ্রিয় থেকে গায়েব করতে পারেন নি। কিন্তু যখন তারা [মিশরের মহিলারা] হযরত ইউসুফকে দর্শন করলো, শুহুদের হালে পড়ে নিজের ইন্দ্রিয়কে হারালো এবং নিজে নিজেই হাত কেটে ফেললো।

তেইশতম পরিচ্ছেদ

তাজরিদ [বহির্গামী বিচ্ছেদ] ও তাফরিদ [অন্তর্মুখী নিঃসঙ্গতা]

তাজরিদ অর্থ হলো:

বাহ্যিকভাবে দুনিয়াবী খাহিশাতকে বর্জন করা এবং অভ্যন্তরীণ দিকে পরকালের ও ইহকালের প্রতিদান অগ্রাহ্য করা।

সত্যিকার মুজাররদ [তাজরিদের অধিকারী ব্যক্তি] হচ্ছেন ঐ ব্যক্তি যিনি, দুনিয়া থেকে তাজাররুদ হয়েছেন কোনো প্রতিদান পাওয়ার আশায় নয়- এটার কারণ শুধুমাত্র আল্লাহর নৈকট্য ছাড়া আর কিছু নয়।

যে ব্যক্তি বাহ্যিকভাবে দুনিয়াবী প্রয়োজনকে বর্জন করেছে, আর এর বদলা এ ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ায় আশা করে কিংবা পরকালে উপকৃত হতে চায়, অবশ্যই সে জাগতিক বিষয়-আশয় থেকে মুক্ত হয় নি। আর এ জগৎ হচ্ছে রদবদল ও ব্যবসার।

উপাসনার মাধ্যমে সকল আনুগত্য হবে একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টিকল্পে। এতে থাকবে না কোনো প্রতিদান পাওয়া বা ইচ্ছা পূরণের আকাঙ্ক্ষা।

তাফরিদের অর্থ হচ্ছে:

নিজের চেষ্টায় আমল করার ক্ষমতাকে বর্জন এবং এসব আমলকে গোপন করা ও এগুলো আল্লাহর পক্ষ থেকে ব্যক্তির প্রতি দয়া ও অনুগ্রহ হিসাবে মেনে নেওয়া।

তাজরিদ হলো আমলের প্রতিদান পাওয়ার আকাঙ্ক্ষাকে বর্জন করা। আর তাফরিদ হলো ভালো আমলের তাওফিক এসেছে আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়ার বদৌলতে- এটা দৃঢ়ভাবে ধারণ করা।

চব্বিশতম পরিচ্ছেদ

মাহব [নিশ্চিহ্নকরণ] ও ইসবাত [নিশ্চিতকরণ]

সুফিদের মতে 'মাহব' অর্থ: বান্দার অস্তিত্বকে বিলুপ্তকরণ। **'ইসবাত' অর্থ:** (মাহব এর পরে) পুনরায় বান্দার অস্তিত্ব নিশ্চিতকরণ। উভয়টি কিন্তু অনুভব হয় চিরন্তনের ইচ্ছায়। মাহবকে '**নফি**'ও বলে।

মাহবের তিনটি স্তর আছে। যথা:

(ক) সর্বনিম্ন স্তর - এটা হচ্ছে ত্রুটিপূর্ণ গুণাগুণ ও অন্ধকারাচ্ছন্ন আমলের মাহব।

(খ) মধ্যম স্তর - এটা হচ্ছে ত্রুটিপূর্ণ ও প্রশংসনীয় গুণাগুণের মাহব।

(গ) সর্বোচ্চ স্তর - এটা হচ্ছে জাতের মাহব।

প্রত্যেক মাহব এর বিপরীতে আছে ইসবাত। মাহব [অস্তিত্ব নিশ্চিহ্নকরণ] আর 'ফানা' [নিশ্চিহ্নকরণ] সমার্থবোধক। অপরদিকে ইসবাত [অস্তিত্ব নিশ্চিতকরণ] আর 'বাকা' [স্থায়ীত্বাবস্থা] সামর্থবোধক। উভয়ের মধ্যে যে সামান্য পার্থক্য বিদ্যমান তা অনুভব করা একমাত্র দয়ালু বন্ধু ও উদার বিশ্বাস ছাড়া সম্ভব নয়।

জাতের ফানার স্তর পরে বাকা আসে না এবং ইসবাতও জরুরী নয়। সুতরাং, মনোরম গুণাবলী ও সুন্দর আমলের ইসবাত, স্বাভাবিক অপকর্ম ও পাপকার্য এর মাহব এর পরে আসা শর্ত নয়।

জাতের ফানার পরে ভালো গুণাবলী অর্জিত হতে পারে। কিন্তু তাদের মাহব জাতের মাহব এর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। মাহব ও ইসবাত সাধারণত ফানা ও বাকার

স্তর- করণ ফানা ও বাকা আসে না যতক্ষণ না মানবতার মাহব ও প্রভুর অস্তিত্বের ইসবাত আসে।

মাহব সাধনে সুফিরা ব্যবহার করেন:

সাহক [গুঁড়ো করা], গুণাগুণের নির্যাসকে মুছে ফেলা।
মাহক [উচ্ছেদকরণ], জাতের নির্যাসকে মুছে ফেলা।
তামস [বিলোপণ], গুণাগুণ ও জাতের প্রভাবকে মুছে ফেলা।

পঁচিশতম পরিচ্ছেদ

তালউইন [পরিবর্তন] এবং তামকিন [স্থিরতা]

তামকিনের নিদর্শন হচ্ছে: আল্লাহর নৈকট্য দ্বারা হৃদয়ের প্রশান্তি হেতু হাক্বিক্বাতের প্রকাশের চিরস্থায়িত্ব।

তালউনের নিদর্শন হচ্ছে: প্রকাশ ও পর্দাবৃত্তের মধ্যে সময়, নফসানী গাইবাতের অনুসরণ ও এর প্রকাশ হেতু হৃদয়ের পরাভুতকরণ।

যে নফসের গুণাগুণের বাইরে যেতে পারে নি, না সে পৌঁছুয়েছে হৃদয় জগতের গুণাগুণে, না সে তালউইনের অধিকারী হয়েছে। কারণ তালউইন হলো স্তরে স্তরে উন্নীত হওয়ার নাম।

যে নফসের গুণাগুণের ভেতর অবস্থান করছে, সে হালের অধিকারীও হতে পারে নি। তবে হৃদয়ের নিয়ন্ত্রকদের ক্ষেত্রে তালউইন সম্ভব। যদিও সে প্রভুর গুণাগুণের জগতে বিচরণশীল না-ও হতে পারে। কিংবা জাতের জ্ঞানার্জন করে নি। কারণ, বাস্তবে গুণাগুণ হচ্ছে সীমাহীন। যেখানে সংখ্যাসীমা নির্ধারণ সম্ভব সেখানে তালউইনও সম্ভব।

আল্লাহর জাতের জ্ঞানের অধিকারীরা তালউইনের সীমা অতিক্রম করেছেন ও তামকিনের স্তরে উপনীত হয়েছেন। কারণ তাঁর [আল্লাহর] একত্ব হেতু জাতের মধ্যে কোনো পরিবর্তন হয় না। যার হৃদয় তার স্তর থেকে উন্নীত হয়ে রূহের স্তরে পৌঁছুয়েছে, সে তালউইন থেকে পলায়ন করতে পেরেছে। গুণাগুণের সংখ্যার প্রভাবের নীচ থেকে যে বেরিয়ে আসতে পেরেছে সে পলায়ন করেছে তালউইন

থেকে। আল্লাহর জাতের নৈকট্যের মুক্ত স্থানে যে অবস্থান করে নিয়েছে সে অবশ্যই তামকিনের বৃত্ত থেকে বেরিয়ে এসেছে।

হৃদয় যখন তার স্তর থেকে রূহের স্তরে উন্নীত হয়, নফস তার স্তর থেকে হৃদয়ের স্তরে পৌঁছায়। তালউইন [যা ইতোমধ্যে হৃদয়ের মধ্যে ছিল] এই স্তরে এসে নফসের দুর্ঘটনায় পরিণত হয়, কব্জ [সংকোচন], বাস্ত [বিস্তারণ], দুঃখ, আনন্দ, ভয় ও আশার মাধ্যমে। তালউইনের অধিকারী হৃদয়ের খলিফা হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে তার নফস। প্রকাশের নূর ও পর্দাবৃত না থাকার নিশ্চয়তা হেতু এই তালউইন অবশ্যই নিন্দনীয় তালউইন নয়।

মানবিক কৃষ্টি যতক্ষণ পর্যন্ত বিদ্যমান থাকবে, এটা অসম্ভব যে স্বাভাবিক পরিবর্তন সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন হবে। কিন্তু এই পরিবর্তন স্থিরতায় পৌঁছুয়েছেন এমন তামকিনের অধিকারীর জন্য নয়।

ছাব্বিশতম পরিচ্ছেদ

আওরাদ [ইবাদত-অনুশীলন] এবং কালিমায়ে শাহাদাত [ঈমানের স্বাক্ষ্যবাক্য]

বান্দা জিহ্বা দ্বারা একটি বাক্য উচ্চারণ করবে যাতে আছে দু’টি স্বাক্ষ্য। অর্থাৎ সে বলবে: লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ [আমি স্বাক্ষ্য দিচ্ছি] আল্লাহ ছাড়া কোনো মা’বুদ নেই, [আমি আরো স্বাক্ষ্য দিচ্ছি] মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহর প্রেরিত রাসূল। আল-কুরআনে এ দু’টি পবিত্র বাক্য আলাদাভাবে প্রকাশ পেয়েছে। এ বাক্য দু’টোর জামা’ [এত্রিকরণ] হচ্ছে কালিমা তায়্যিবাহ।

নিজের হৃদয়ে সত্যতা প্রতিপন্ন করতে উক্ত স্বীকারোক্তিতে তাকে স্বাক্ষ্যদান করতে হবে। শাহাদতের [স্বাক্ষ্য প্রদানের] গুরুত্ব অত্যন্ত বিরাট। কারণ নিজের নফসের ক্ষেত্রে প্রতিটি স্বীকারোক্তিই একেকটি শাহাদাত। শাহাদাত স্বয়ং কোনো স্বীকারোক্তি নয়।

ঠিক যেমনি প্রত্যেক স্বীকারকারী যা সে স্বীকার করেছে তার স্বাক্ষ্যদাতা, ঠিক তেমনি [ঈমানের] স্বীকারকারীও সে তার ঈমানের স্বাক্ষ্যদাতা এবং শরয়ী আইন-কানুনের সীমাবদ্ধতায় আবদ্ধ হলো। স্বীকারোক্তির শাহাদতের মধ্যে সন্দেহের কোনো স্থান নেই। যদিও স্বীকারোক্তি মানুষের ‘মুখের কথা’ মাত্র, তথাপি এটাই হলো সর্বাধিক সম্মানজনক একটি আমল। কারণ অর্থের দিক থেকে:

ক. ‘আমল’ হচ্ছে শীয়তের নির্দেশ মুতাবিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ব্যবহার।

খ. ‘ইকরার’ [স্বীকারোক্তি] হচ্ছে ধর্মবিশ্বাসের জন্য জিহ্বার ব্যবহার।

জিহ্বা হলো হৃদয়ের স্বাক্ষ্যের দোভাষী। হৃদয়ের রহস্যকে জিহ্বা ব্যাখ্যা করে ভাষার মাধ্যমে। সে স্বাক্ষ্য দেয় হৃদয়ে রক্ষিত ঈমানের। শুধু তাই নয়, শরীরের অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও হৃদয়ের দোভাষী। হৃদয়ে রক্ষিত ভাষাহীন রহস্যকে এগুলো কর্মের মাধ্যমে বাস্তবতা প্রদান করে। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কর্ম হলো হালের প্রমাণ।

শাহাদাত বা স্বাক্ষ্য শুধু মুখের কথা তথা জিহ্বা দ্বারা দেওয়া হয় না, বরং তা আমলের জিহ্বা দ্বারা দিতে হবে। সুতরাং জিহ্বার অভ্যন্তরীণ দিকে একটি বাক্য আছে ও বাইরের দিকে আছে একটি আমল। ঈমানের প্রত্যেক খুঁটিতেই আছে অভ্যন্তরীণ দিকে একটি বাক্য ও বাইরের দিকে একটি আমল। শরীয়তের নির্দেশ মুতাবিক মানুষ তার হাত-পা কর্মশীল করে। একই সময় হালের জিহ্বা হৃদয়ে লালিত ঈমানের স্বক্ষ্যদান করে।

‘**ইকরার**’ ও ‘**আমল**’ উভয়টি হলো ঈমান থাকার সাক্ষী। ঈমান হচ্ছে হৃদয়ের সত্যাসত্য নির্ধারণ, জিহ্বার স্বীকারোক্তি এবং [শরীয়তের নির্দেশ মুতাবিক] হাত-পায়ের আমল।

এটা নয় যে, ঈমানের নির্যাস স্বীকারোক্তি বা আমল, কারণ শুধু ঈমান হলো হৃদয়ের সত্যাসত্য নির্ধারণ। স্বীকারোক্তি ও আমল উভয়টি হচ্ছে নিদর্শন, যদিও উভয়টির স্বাক্ষ্যদান হয়তো বাতিল হতে পারে। যেমন মুনাফিকরা করে থাকে। তাদের মধ্যে দেখা যায় শক্ত স্বীকারোক্তি ও আমল আছে, কিন্তু ঈমানের মধ্যে জড়তা বিদ্যমান।

তবে মানুষের অন্তরে ঈমান আছে কি না তা জানা খুব কঠিন। একদা হযরত বিলাল রাদ্বিআল্লাহু আনহু জিহাদের ময়দানে এক কাফিরকে কতল করার সময় সে শাহাতাদের বাক্যটি উচ্চারণ করলো। কিন্তু বিলাল রাদ্বিআল্লাহু আনহু এতে অনড় থাকলেন ও তার মস্তক দ্বিখণ্ডিত করে দিলেন। পরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট বিলাল রাদ্বিআল্লাহু আনহু ঘটনাটি বর্ণনা করলেন। তিনি তাঁকে তিরস্কার করলেন। বিলাল বললেন, কিন্তু লোকটি তো শাহাদাত বাক্য উচ্চারণ করেছিল ভয় থেকে, সত্যিকার ঈমানদার হওয়ার জন্য নয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ‘তুমি কি তার অন্তর চিরে দেখেছিলে? তুমি কিভাবে জানলে তার অন্তরে ঈমান নেই?’

সাতাশতম পরিচ্ছেদ

জুহদ [কৃচ্ছ্রসাধনা]

জুহদ হলো:

ক. দুনিয়ার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ থেকে হৃদয়বিমুখতা। দুনিয়াবী লোভ-লালসাকে পরিত্যাগ করা।

খ. তাওবা এবং ওয়ারা' [পরহেজগারী] এর তৃতীয় স্তরকেও জুহদ বলে।

আল্লাহর রাস্তায় ভ্রমণকারী প্রথমত একান্ত আন্তরিক ধৈর্যসহ নিজের নফসকে গুনাহ থেকে বাঁচিয়ে রাখবে। বাঁচিয়ে রাখবে নফসকে [গুনাহ করার] অতি আকর্ষণীয় উল্লাস থেকে। সে তার হৃদয়ের মধ্যে জমাটবাঁধা লোভ-লালসার মরিচাকে পরহেজগারীর রেত দ্বারা ঘষেমেজে পালিশ করবে। এর ফলে হৃদয় মাঝে ভেসে আসবে ইহ-পরকালের হাক্বিক্বাতের নূর। সে দেখবে ইহজগৎ মূলত কদর্য ও অস্থায়ী। এ থেকে হৃদয়বিমুখতা সৃষ্টি হবে। সে দেখতে পাবে পরকালের সৌন্দর্য ও স্থায়িত্ব এবং তার হৃদয় সেদিকে আকর্ষিত হবে।

পরিত্যাগকরণ ও একাকিত্ব হলো:

(ক) শেষের ব্যক্তিদের জন্য জুহদের হাক্বিক্বাতের প্রয়োজন নেই।

(খ) প্রাথমিক স্তরের ব্যক্তির জন্য জুহদ একটি পূর্বশর্ত।

জুহদের প্রশংসা বর্ণনা করতে যেয়ে অধিকাংশ মাশাইখে আজম বলেছেন, এটার দ্বারা প্রতারক ও আন্তরিক সালিকদের চেনা যায়। সম্পদের লোভ ও দুনিয়াবী ফুর্তি-আনন্দকে বিসর্জন দেওয়া একটি জরুরী আমল।

জুহদ তিন ধরনের:

১. সাধারণ জুহদ- প্রাথমিক স্তরের ব্যক্তিদের।

২. জুহদের মধ্যে জুহদ- এটা বিশেষ ধরনের জুহদ যা দ্বিতীয় স্তরের ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে খাস। এর বৈশিষ্ট্য হলো, জুহদের মাধ্যমে ভোগ- বিলাসের বস্তু-সামগ্রী পরিত্যাগ করা। সালিকের অভ্যন্তরীণ ইচ্ছার মধ্যে পরিবর্তন সাধন। যে নফস ইহজগতের আনন্দ-উল্লাসে আগ্রহী, তাকে পরকালের অনন্ত সুখ-শান্তির প্রতি আকর্ষিত করা। ফানার মাধ্যমে নিজের ইচ্ছার বিলুপ্তি ঘটিয়ে আল্লাহর ইচ্ছার প্রতি আত্মসমর্পণের হাক্বিক্বাত উপলব্ধিকরণ।

৩. বিশেষ ব্যক্তিদের বিশেষ জুহদ হচ্ছে তৃতীয় স্তরের। এই জুহদ স্বয়ং আল্লাহর সাথে। এরূপ উচ্চ পর্যায়ের জুহদ নবী-রাসূল ও অন্যান্য পবিত্রাত্মাদের ক্ষেত্রে খাস। এটা আল্লাহর ইচ্ছার মাধ্যমে বান্দার মধ্যে ফানার স্তরে উপনীত হওয়ার জগৎ।

জুহদ হলো হিকমাতের ফলাফল এবং ইলমের জন্ম।

জুহদের ব্যবহারে দুনিয়াবী ভোগ-বিলাস হচ্ছে অজ্ঞতার ফলাফল ও হৃদয়নেত্রের অন্ধত্বের জন্ম- যেভাবে হাদিসে বর্ণিত হয়েছে। ক্ষণস্থায়ী দুনিয়াকে বর্জন করা ও চিরন্তন পরকালের আনন্দকে গ্রহণ করার মাধ্যমে জাহিদ ব্যক্তি (আল্লাহর ইচ্ছার) শক্ত ভিত তৈরি করে। ভিত তৈরি করে তার নিজের আমলেরও। হযরত লুকমান আলাইহিস্সালাম ও আবু বকর শিবলী রাহমাতুল্লাহি বলেছেন:

> হাক্বিক্বাতের মাধ্যমে উপকারলাভ জুহদের স্তর, এর মাহাত্ম্য এবং চেষ্টা-সধনার পরমানন্দকে অস্বীকৃতির নাম নয়। উপরন্তু জুহদের বিনয়াভাবের মাধ্যমে জাহিদের দৃষ্টিপাতে, হাক্বিক্বাতের প্রয়োজনীয়তা হচ্ছে অহঙ্কারকে তাড়ানো।

অটাশতম পরিচ্ছেদ

ফকর [দীনতা]

হাক্বিক্বাতের রাস্তার পবিত্র ভ্রমণকারী ব্যক্তি যতক্ষণ পর্যন্ত জুহদের স্তর অতিক্রম করবে না, ততক্ষণ পর্যন্ত ফকরের স্তরে [যার অর্থ ব্যক্তিগত অস্থাবর সম্পত্তি গ্রহণ না করা] উপনীত হতে পারবে না। সম্পদের মালিক না হয়েও কারো অন্তরে যদি জাগতিক ভোগ-বিলাসের প্রতি আগ্রহ থেকে থাকে, তাহলে এ ব্যক্তির ক্ষেত্রে ফকর নামের ব্যবহার মূলত বিভ্রম ছাড়া আর কিছু নয়।

ফকরে আছে একটি উপাধি, একটি অভ্যাস ও একটি হাক্বিক্বাত।

এর উপাধি হচ্ছে: জাগতিক অস্থাবর সম্পদ বর্জন করা, এর প্রতি আকর্ষণ সত্ত্বেও।

এর অভ্যাস হচ্ছে: জুহদ সত্ত্বেও জাগতিক অস্থাবর সম্পদকে বর্জন।

এর হাক্বিক্বাত হচ্ছে: জাগতিক অস্থাবর সম্পদ গ্রহণের সম্ভাবনাহীনতা।

হাক্বিক্বাতের অধিকারী ব্যক্তি যেহেতু জানেন যে, ভূমির প্রভু (আল্লাহ) যাবতীয় সম্পদের মালিক, তাই তার জন্য সম্পদ অপরকে দান করা আইনবহির্ভুত কাজ বলে বিবেচিত হয় [অর্থাৎ তিনি কোনো কিছুর মালিকই নন বলে জানেন- এটাই ফকর]। মূলত সম্পদশালী ব্যক্তি সম্পদের মালিক নন- বরং জিম্মাদার। সুতরাং অপরকে নিজে কিছু দান করা তার জন্য আদৌ অযৌক্তিক- বরং তিনি প্রভুর মাল অপরকে হস্তান্তর করছেন মাত্র।

ফকরের নিদর্শন হলো:

ধন-সম্পদ থাকুক বা না থাকুক হাক্বিক্বাতের অধিকারী ব্যক্তির ফকরে কোনো পরিবর্তন হয় না। এমনকি সমগ্র জগতের মালিক হয়ে গেলেও তাদের মধ্যে পরিবর্তন আসে না।

ফকরের বিপরীত হলো:

ঐ ব্যক্তি যে ফকরের হাক্বিক্বাতের সামান্যতম ছায়া মাত্র দেখেছে। তার হৃদয়ে এর গভীরার্থ দানা বাঁধে নি। এদের ফকর মূলত একটি দুর্ঘটনাজণিত গুণাগুণ। সম্পদ লাভ করলেই তাদের মধ্যে পরিবর্তন আসে। তারা ভাবে সম্পদের মালিক হয়ে গেছে।

ক. প্রাথমিক ও মধ্যম স্তরের সালিকের জন্য ফকর হলো সম্পদ থেকে অধিক উত্তম।

খ. শেষের স্তরের সালিকদের জন্য ফকর ও সম্পদের মধ্যে পার্থক্য নেই।

সম্পদ শেষের স্তরের ব্যক্তিদেরকে ফকরের হাক্বিক্বাত থেকে বিস্মৃত করে না- যা হযরত আবদুল্লাহ বিন জাল্লাদ রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন। যদিও ফখর ও সম্পদ তাদের নিকট সমপর্যায়ের, তথাপি সম্পদ থেকে প্রাপ্ত উপহারসামগ্রীর মর্যাদা তাদেরকে মোটেই আকর্ষিত করে না- এ কথাটি বলেছেন হযরত আবুল হাসান নূরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি।

ফুকারাদের বিভিন্ন দল আছে:

(ক) যারা মনে করেন, এ জগতে বাস্তকে কোনো সম্পদ বা ব্যক্তিগত সম্পদ নেই। যদি কিছু নিজেদের ক্ষমতাভুক্ত হয়, তারা এগুলো বিলিয়ে দেন। এগুলো কিংবা পরজগতের সম্পদের প্রতি তাদের কোনো আকর্ষণ নেই।

(খ) যারা মনে করেন, তাদের নিজের আমল ও আনুগত্য নিজেদের নয়- যদি তাদের মাধ্যমেই এগুলো আঞ্জাম দেওয়া হয়। তাদের কোনো সম্পদের খবর তারা রাখেন না। তারা আমলের পরিবর্তে প্রতিদানেরও আশা করেন না।

(গ) যারা মনে করেন, আমল ও আনুগত্য তাদের হাল ও মাক্বাম থেকে হয় না। সবকিছুই তাদের মতে, একমাত্র আল্লাহর অনুগ্রহ ছাড়া কিছু নয়।

(ঘ) যারা মনে করেন, নিজেদের জাত ও অস্তিত্বও তাদের নিজের কিছু নয়। এমনকি তাদের '**নিজ**' কী তা-ও তারা জানেন না। তাদের জাত কিছুই নয়- না তাদের কোনো গুণগুণ বিদ্যমান। না হাল, না মাক্বাম, না আমল। উভয় জগতে তাদের কোন চিহ্নই নেই!

'**প্রয়োজন**' হচ্ছে প্রয়োজনের মুখাপেক্ষি ব্যক্তির একটি গুণ। এটা তার স্বভাবে বিদ্যমান। এখানে না স্বভাব প্রতিপন্ন হয়- না প্রতিপন্ন হয় গুণ। এটাই ফকরের অর্থ- এরূপ অর্থে কোনো কোনো সুফির মধ্যে ফকর নেই।

এরূপ উচ্চতর ফকরের অধিকারীদের উভয় জগতে আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানেন না, চিনেন না। বিশ্বজগতের প্রভু এদের ব্যাপারে ঈর্ষাপরায়ণ! তিনি এদেরকে অপরের দৃষ্টি থেকে লুকিয়ে রাখেন- এমনকি তাদের নিজেদের থেকে লুকানো রাখেন। এরূপ ফকর হচ্ছে সুফিয়ে কিরামের স্তর। এটা শেষের ব্যক্তিদের স্তর।

সালিকের প্রত্যেক স্তর অতিক্রমণে বিশেষ গতি আছে। কোনো সময় এ গতি বৃদ্ধি পায়, কোনো সময় হ্রাস হয়। সালিকদের প্রথম স্তর হচ্ছে তাওবার।

উনত্রিশতম পরিচ্ছেদ

তাজাররুদ [কৌমার্য-ব্রত] এবং তা'আহহুল [বিবাহসম্পর্ক]

বিবাহ সম্পর্ক ওদের জন্য জরুরি:

ক. যাদের মধ্যে পরহেজগারিতার কমতি, [কামনা-বাসনা পরিত্যাগের ব্যাপারে] ধৈর্যহীনতা, অবস্থা ভেদে পাপকার্যে লিপ্ত হওয়ার প্রবণতা এবং জিনায় লিপ্ত হওয়ার প্রতি আকর্ষণ বিদ্যমান।

খ. যাদের নফস আকাঙ্ক্ষা থেকে ফিরে গেছে, অতি আকাঙ্ক্ষা থেকে বিরত হয়েছে, হৃদয়ের সম্পর্ক হেতু বিদীর্ণ হয়েছে ও হৃদয়ের উপদেশের ওপর আন্তরিক হয়েছে।

তাজাররুদ (অবিবাহিত থাকা) ও তাফাররুদ তাদের জন্য উত্তম:

যারা আকাঙ্ক্ষার সুফলে আছে, আকাঙ্ক্ষার আসনে যাদের নফস বিফল এবং যারা ভ্রমণের মাঝপথে আছে।

একজন দরবেশকে প্রশ্ন করা হলো, 'আপনি কেনো একজন স্ত্রী গ্রহণ করছেন না?' দরবেশ জবাব দিলেন, 'পুরুষের জন্য স্ত্রী মানায়। আমি এখনও পুরষের স্তরে উন্নীত হই নি! সুতরাং স্ত্রীর আকাঙ্ক্ষা আমার মধ্যে আসবে কোত্থেকে?'

একই প্রশ্ন আরেকজন দরবেশকে করা হলে, তিনি জবাব দিলেন, 'বিবাহের চেয়ে আমার নফসকে তালাক দেওয়া বেশি জরুরী! নফসকে তালাক দিতে পারলেই আমার জন্য স্ত্রী গ্রহণ করা বৈধ হবে।'

দরবেশ বাশারীকে লোকেরা বললো, আপনার সম্পর্কে মানুষ এই সেই বলে কেনো? তিনি জবাব দিলেন, 'তারা কী বলে?' তারা বললো, 'মানুষ বলে, আপনি বিহাবের সুন্নাত পরিত্যাগ করেছেন।' তিনি বললেন, 'তাদের বলো- আমি যেহেতু ফরজ-ওয়াজিব নিয়ে ব্যস্ত তাই এই সুন্নাত পালনে অপারগ।'

হাক্বিক্বাতের রাস্তায় ভ্রমণকারীর ব্যাপারে জানা আছে যে, ভ্রমণের শুরুতে (বৈবাহিক বা অন্যান্য) সম্পর্কে জড়িত না থাকা, দেরি না করা, সংকল্পে শৈথিল্য না হওয়া এবং স্বাভাবিক প্রবণতাকে বিসর্জন দেওয়া জরুরী।

একদিকে:
বিবাহের কারণে সম্পদ ও অর্থোপার্জনের প্রতি মানুষের হৃদয়ের আকর্ষণ সৃষ্টি হতে পারে', হয়তো বা দৃঢ়তার উচ্চতা থেকে নেমে আসতে হয় নীচতায় এবং কৃচ্ছ্রসাধনা ও আল্লাহপ্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষার পরিবর্তে অন্তরে সৃষ্টি হয় দুনিয়ার প্রতি লোভ-লিপ্সা। সুতরাং সংসারী না হওয়া দুর্বল চিত্তের সালিকের জন্য খাস।

বিপরীত দিকে:
যারা বিবাহ সম্পর্ক ও পরিবার-পরিজন নিয়ে আল্লাহর ওলায়তের স্তরে উপনীত হয়েছেন তাদের মর্যাদা অবিবাহিত জাহিদের চেয়েও উচ্চে। কারণ তারা তো স্ত্রী-পুত্র-কন্যা ও সম্পদ-সম্পত্তির বৃত্তের ভেতর থেকেও বর্জন করেন নি তরীকতের রাস্তাকে। তরীকতের রাস্তায় সফল ওসব গায়র-মুরাররদ মহাত্মন ব্যক্তি জাগতিক পরীক্ষায় [স্ত্রী-পুত্র-কন্যা ও সম্পদ-সম্পত্তি মূলত পরীক্ষা বৈ নয় - যেমন কুরআনে উল্লেখিত হয়েছে] উত্তীর্ণ হওয়ার ফলে নৈকট্যশীল বান্দায় পরিণত হয়েছেন।

ত্রিশতম পরিচ্ছেদ

তাওয়াক্কুল [আল্লাহ-ভরসা]

তাওয়াক্কুলের নিদর্শনাবলী হলো:

১. নিজের যাবতীয় ব্যাপারে মহান একক আল্লাহর উপর ভরসা।

২. দৈনিক জীবনচলার পথে যা কিছু ঘটে ও ঘটবে তা অবশ্যই নির্ধারিত- এ বিশ্বাস আত্মিকভাবে গোপনে ধারণ রাখা।

তাওয়াক্কুলের স্তর আসে রিদ্বা (আশা) স্তরের পর। কারণ আল্লাহ-ভরসা ও গোপনে নির্ভরশীলতার মূলে আছে প্রভুর অসীম দয়া সম্পর্কে সম্যক অবগত হওয়া।

তাওয়াক্কুল হচ্ছে: ঈমানের সত্যতার ফলাফল। যা আসে চেষ্টা-সাধনা (শরীয়তের অনুসরণ) ও তাকদীরের উপর বিশ্বাসের মাধ্যমে।

এ ঈমান হলো ইয়াক্বিনের (বা নিশ্চিততার) স্তরের- এরূপ ঈমানদার জানে, সবকিছুই পূর্বনির্ধারিত এবং ওগুলো ভাগ করে দেওয়া হয় (যারতার) তাকদির মুতাবিক।

হাযারাত যুননুন মিশরী, সারে সাক্বাতি, জুনাইয়িদ বাগদাদী, হামাদুন ই কাস্সার ও সাহল ইবনে তুসতরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিম বলেছেন, "প্রত্যেক স্তরের শুরু আছে- আছে তার সাফল্য স্বীয় সম্মুখভেদে। আর প্রতিটি স্তরের শেষও আছে- আছে তার ব্যর্থতা স্বীয় পেছনভেদে। কিন্তু তাওয়াক্কুলের স্তর ভিন্ন। এর সবকিছুই শুরু এবং সাফল্য। এর কখনও শেষ নেই। নেই কোনো ব্যর্থতা।"

সত্যিকার মুতাওয়াক্কিল (ভরসাকারী): হক্ক মুতাওয়াক্কিল ঐ ব্যক্তি যার দৃষ্টিতে কারণসৃষ্টির কারণ এর (অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার) অস্তিত্ব ছাড়া আর কোন কিছুই দৃশ্যমান নয়। তার তাওয়াক্কুল কখনও কারণের অস্তিত্ব কিংবা অনস্তিত্ব দ্বারা পরিবর্তন হয় না।

এটাই হচ্ছে ঐ ব্যক্তির তাওয়াক্কুল যিনি তাওহিদের (আল্লাহর একত্বের) স্তরে উন্নীত হয়েছেন। এ স্তরে উন্নীত না হওয়া পর্যন্ত মুতাওয়াক্কিল তার নিজের মাক্বাম পরিবর্তনে কারণকে বিজর্সন দিতে হবে; কারণ, তার তাওয়াক্কুলে 'কারণে'র অস্তিত্বের ওপর বিশ্বাস হচ্ছে নিন্দনীয়। সুতরাং, কারণগুলোকে তাড়াতে যেয়ে সে চিরসচেষ্ট থাকে।

কারণসমূহকে পরিত্যাগ করে এ মাক্বামকে উন্নতীকরণের ক্ষেত্রে হযরত ইব্রাহিম খাওয়াস রাহিমাহুল্লাহর অবস্থা সম্পর্কে সকলেই অবগত। তিনি কখনও ৪০ দিনের বেশি কোনো স্থানে অবস্থান করতেন না। মানুষের নিকট নিজের অবস্থাকে গোপন রাখতে খুব সতর্ক থাকতেন। এর ফলে তাঁর তাওয়াক্কুলের স্তর, দৈনিক প্রয়োজনীয় খাবারের তাগিদে লোকজনের কাছে উন্মোচন হওয়ার সুযোগ হতো না। সাধারণত তিনি মরুভূমি, নির্জনভূমি, একাকিত্ব, স্বল্প খ্যাদ্যপ্রাপ্তির এলাকা ইত্যাদি অঞ্চলে ঘুরে বেড়াতেন।

মুতাওয়াক্কিলের হালের শক্তি সম্বন্ধে শরীয়তের মহান প্রতিষ্ঠাতা রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নির্দিষ্ট করে বলে দিয়েছেন: "যে ইয়াকীন ও তামকীনের অধিকারী হয়েছে, তার তাওয়াক্কুল তাকে বিপর্যয়ের সময় মাথা ঘুরায় না কিংবা শরীরে কম্পন জাগায় না।"

একদল লোক হযরত জুনাইদ বাগদাদী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে প্রশ্ন করলেন,

প্র.- আমরা যদি দৈনিক প্রয়োজনীয় খাবার ও রসদপত্র সংগ্রহের জন্য কোনো চেষ্টা-সাধনা না করি, তাহলে কী হবে?

উ.- তোমরা যদি মনে করো রিজিকদাতা তোমাদেরকে ভুলে গেছেন, তাহলে রিজিকের সন্ধান করো।

প্র.- তাহলে কী আমরা ঘরে বসে থাকবো এবং তাওয়াক্কুল করবো?

উ.- তোমাদের তাওয়াক্কুল দ্বারা আল্লাহকে পরীক্ষা করো না; কারণ আশাহত অবস্থা থেকে বাঁচতে যেয়ে তোমরা কিছুই পাবে না।

প্র.- তাহলে আমরা কী ভাববো?

উ.- ভাবনাকে বিসর্জন দাও!

একত্রিশতম পরিচ্ছেদ

রিজা [সন্তোষ]

রিজার অর্থ হলো, অন্তর থেকে কাজা (অদৃষ্ট) এবং ক্বদর (ভাগ্য) সৃষ্ট সকল বিতৃষ্ণা ওঠানো ও মুছে ফেলা। রিজার স্তর আসে তাওয়াক্কুলের স্তরকে অতিক্রম করার পর।

রিজার মাক্বাম হচ্ছে সালিকের ভ্রমণপথে শেষ মাক্বাম। এই মক্বামে যে কেউ পদার্পণ করেছে, দ্রুত সে চিরশান্তির বেহেশতে পৌঁছুয়ে গেছে। কারণ, রিজা ও ইয়াক্বিনের মধ্যে সে প্রতিষ্ঠিত করেছে রূহ ও প্রশান্তিকে। এ উভয়টি হলো বেহশতবাসীর প্রয়োজনীয় উপকরণ।

বেহেশতের দারওয়ান 'রিজওয়ান' ফিরিশতার নামকরণ থেকে রিজার মাক্বামের মাহাত্ম্যের ইঙ্গিত মিলে। 'ইয়াক্বিন' (নিশ্চিততা) থেকে 'রিজা'র জন্ম। যতক্ষণ পর্যন্ত ইয়াক্বিনের নূর দ্বারা হৃদয় বিচ্ছুরিত এবং গলে না যাবে, ততক্ষণ এতে (হৃদয়ে) ঘটনা, বিপর্যয় এবং প্রশান্তি নিয়ন্ত্রণাধীন হবে না।

ঘৃণাকে পরিত্যাগ (যা হচ্ছে রিজার মাক্বামের সূত্র) করা হচ্ছে নিজের ইচ্ছাকে পরিত্যাগ করার ফল।

রিজার মূল সূত্র হচ্ছে ইয়াক্বিন, এবং বক্ষ সম্প্রসারণ এর জরুরত। ঘৃণার সূত্র হচ্ছে সংশয়, এবং বক্ষ সংকোচন এর জরুরত।

একদা হযরত আবু বকর শিবলী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (স্বীয় পীর) হযরত জুনাইদ বাগদাদী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির সম্মুখে বলে ওঠলেন: "**লা- হাওলা ওয়ালা কুয়্যাতা ইল্লাবিল্লাহ্**"। জুনাইদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি মন্তব্য করলেন,

- এ বাক্যটি (এখন) এসেছে হৃদয়ের সংকোচন থেকে- যার সূত্র হলো রিজা'র বিসর্জন।

শিবলী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি সমর্থন জানিয়ে বললেন,

- আপনি সত্য বলেছেন।

ঘৃণা দু'ধরনের:

১. হৃদয়ের ঘৃণা- যার বিপরীত হলো রিজা।

২. নফসের ঘৃণা- যার বিপরীত হলো রিজার হাল ও মাক্বাম।

সম্ভবত কোনো কোনো হৃদয়ে এই সন্দেহ বা প্রশ্ন জাগতে পারে: যদি 'হাল' (অবস্থা) এর [ঘৃণার] পূর্বসূত্র ও মূল থেকে থাকে তাহলে কীভাবে রিজার হালের বিপরীত এর মাক্বামের সাথে সম্পর্কিত হতে পারে?

এর জবাব হচ্ছে এই: 'হাল' একটি উপহার মাত্র। এর মাত্রাতিরিক্ত সূক্ষ্মতা ও গভীরে প্রবেশের ক্ষমতা অস্তিত্বের সকল অংশে সক্রিয় হয়। এর ফলে স্বাভাবিক ইচ্ছার সংশয় অনুপস্থিত হয়ে পড়ে। অপরদিকে, মাক্বাম (স্তর) কস্ব (অর্জিত বস্তু) এর সঙ্গে মিশ্রিত। সুতরাং এতে স্বাভাবিক ইচ্ছার মিজাজ সম্পর্কে সংশয় থাকতে পারে।

ঠিক যেভাবে রিজা হচ্ছে ইয়াক্বিনের ফলাফল যা হলো হৃদয়ের একটি বিশেষ গুণ, ঠিক সেভাবে হৃদয়ের জন্য বৈশিষ্ট্যপূর্ণ হলো রিজার গুণ।

রিজার মাক্বামের জন্য জরুরী বিষয় হলো মুহাব্বাতের 'হাল' [অবস্থা]। কারণ যখন সব কর্ম রিজার মধ্যে পড়ে যায়, যার মূলে আছেন প্রেমাস্পদ, তখন সকল কর্মই হয়ে যায় প্রেমাস্পদ।

ইহ-পরকালে বান্দা থেকে রিজা ও মুহাব্বাত কখনও আলাদা হয় না; এটা পরজগতে ভয় ও আশা থেকে ভিন্ন, যেখানে এ দুটো বান্দা থেকে আলাদা হয়ে যায়।

বত্রিশতম পরিচ্ছেদ

মুহাব্বাত [প্রেম]

ঠিক যেরূপ 'তাওবাহ' হলো সকল উত্তম মাক্বামের মূল; সেরূপ 'মুহাব্বাত' হচ্ছে সকল উন্নত 'হাল' এর মূল। আর মুহাব্বাত যেহেতু মূলত একটি তুহফাহ্ (উপহার) তাই এর ওপর ভিত্তিশীল যাবতীয় হালকে বলা হয় 'মাওয়াহিব' (উপহারসমগ্র)।

মুহাব্বাত হচ্ছে সৌন্দর্যকে মনোযোগসহ বিবেচনার হৃদয়াকর্ষণ; এবং এটার ধরন দু'টি:

১. মুহাব্বাতে আম।

২. মুহাব্বাতে খাস।

নিচের টেবিলে উভয় প্রকার মুহাব্বাতের গুণবলী তুলে ধরা হয়েছে।

সং	মুহাব্বতে আম	মুহাব্বাতে খাস
১.	সৌন্দর্যকে মনোযোগসহ বিবেচনার হৃদয়ের আকর্ষণ।	'যাত' এর সৌন্দর্যকে অবলোকনের আত্মিক আকর্ষণ।
২.	সুন্দর গুণাবলী দর্শন থেকে একটি চন্দ্রের আবির্ভাব।	একটি সূর্য যা 'যাত' এর দিগন্ত থেকে উদয় হয়।
৩.	একটি আলোকরশ্মি যা দান করে অস্তিত্বের মধ্যে রূপসজ্জা।	একটি অগ্নিকুণ্ড যা পবিত্র করে অস্তিত্বকে।
৪.	একটি নিদর্শন যা থেকে উচ্চারিত হয়: "যাকিছু পবিত্র তার অনুকরণ করো; যাকিছু অস্পষ্ট তাকে পরিত্যাগ করো।"	একটি নিদর্শন যা থেকে উচ্চারিত হয়: "না থাকো জ্যান্ত, এবং না খাও খাবার!"।
৫.	সর্বোত্তম সুরা: মোহরকৃত, (বয়স দ্বারা) পরিপক্ক।	সম্পূর্ণভাবে পবিত্র প্রস্রবণ।

৬.	এমন সুরা (পরিপক্কতা হেতু আকাঙ্ক্ষার আকর্ষণযুক্ত): যেমন তিক্ত স্বাদে পবিত্র ও অপবিত্র; মার্জিত ও অমার্জিত; পাতলা ও ভারী।	এমন সুরা (ত্রুটি থেকে পবিত্র হওয়ার কারণে): যেমন সকল পবিত্রতা থেকে পবিত্র; মার্জিত থেকে মার্জিত; নূরান্বিত থেকে নূরান্বিত।

এ সুরার সূক্ষ্মতা ও লঘুতা পানপাত্রের ওজন ও পাতলা গুণকে নিয়ন্ত্রণ করে; পাত্রের অমশৃণ পৃষ্ঠদেশকে পরিবর্তন করে মশৃণে; ঠিক যেরূপ রূহ চোখের মাঝে দান করে সূক্ষ্মতা ও আলোকবর্তিকা।

'জাতে'র প্রেমিকরা রূহের কাপ থেকে পান করে এ সুরা; এবং কলব ও নফস ঢেলে দেয় কাপের তলদেশে জমাকৃত বস্তু।

এটা দান করে:

(ক) শিহরণের লঘুত্ব রূহের মাঝে।
(খ) শওকের লঘুত্ব হৃদয়ে।
(গ) নফসের মাঝে আনুগত্যতার লঘুত্ব।

এ প্রেমের সুরার পরিশিষ্ট অস্তিত্বের সকল অংশে ক্রিয়া করে। এটা দান করে:

(ক) রূহের মাঝে দূরদৃষ্টির মহানন্দ।
(খ) হৃদয়ের মাঝে জিকিরের স্বাদ।
(খ) নফসের মাঝে আমলের প্রতি আসক্তি।

উপরোক্ত আকর্ষণসমূহ এতোই শক্তিশালী হয় যে, আনন্দ-উল্লাসের ক্ষেত্র নফেসর মধ্যে জন্ম নেয় উত্তম আমলের প্রতি স্বাভাবিক প্রবণতা।

মুহাব্বাত সকল অস্তিত্বকে মুছে ফেলে; হালের অবস্থায় প্রেমের রঙ নিজেই উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। হযরত জুনাইদ রাহিমাহুল্লাহ বলেন:
"প্রেমের নিদর্শন হচ্ছে, প্রেমিকের আপন গুণাবলীর বিনিময়ে প্রেমাস্পদের গুণাবলীর মধ্যে প্রবেশ করা।"

মুহাব্বাত অবশ্যই মিলনের সংযুক্তির একটি সংযুক্তি। একমাত্র প্রেমই প্রেমিক ও প্রেমাস্পদের মধ্যে বন্ধন সৃষ্টি করতে পারে। এটা প্রেমাস্পদের প্রতি আকর্ষণের আকর্ষণ, যার মাধ্যমে প্রেমিককে প্রেমাস্পদ কাছে টেনে নেন এবং তার অস্তিত্বকে মুছে ফেলেন। প্রথমত প্রেমিকের গুণাবলীকে আঁকড়ে ধরেন; এবং এরপর স্বীয় কুদরত 'জাতে'র মধ্যে বিলীন করেন। বিনিময়ে, প্রেমাকর্ষণ তাকে দান করে একটি 'জাত' [পরিচিতি] যা নিজের গুণাবলীর মূল্যসাপেক্ষ।

এরপর ['জাতে' প্রবেশকারী ব্যক্তি] তার গুণাবলী পরিবর্তন হয়। হযরত জুনাইদ রাহিমাহুল্লাহ এই মুহূর্তে বলেন:

- বিনিময়ের মাঝে।

তিনি বলেন:

- প্রেমিকের মাঝে।

যতক্ষণ পর্যন্ত প্রেমিক অস্তিত্বশীল, প্রেমাস্পদের 'জাতে'র গুণাবলী বর্ণনা করার সাধ্য নেই।

'হাল' হচ্ছে মুহাব্বাত ও এর সর্বশেষ অবস্থার ফল। এর কারণ অস্পষ্ট তবে 'হালে'র বহু নিদর্শন আছে। প্রেমিকের হালের হাক্বিক্বাতের নিদর্শনসমূহের মধ্যে আছে:

১. প্রেমিকের শরীরের প্রতিটি লোম একেকটি সাক্ষী।

২. প্রেমিকের শরীরের প্রতিটি গতি একেকটি নিদর্শন।

৩. প্রেমিকের শরীরের প্রতিটি স্থিরতা একেকটি সংকেত।

প্রেমিকের চক্ষু ছাড়া কোন চোখ এগুলো দেখতে পায় না। আসল প্রেমিকদের থেকে নকল প্রেমিকদেরকে আলাদা করতে আমরা খোদাপ্রেমিকের ১০টি নির্দশনের বর্ণনা তুলে ধরছি:

১. প্রেমিকের অন্তরে এ জগৎ কিংবা পরজগতের প্রতি কোনো ভালোবাসা থাকবে না।

২. তার সম্মুখে উপস্থাপিত জাগতিক কোনো সৌন্দর্যের প্রতি সে ভ্রূক্ষেপও করবে না। সে কখনো প্রেমাস্পদের সৌন্দর্য থেকে নিজের মুখ ফিরিয়ে নেবে না।

একদা একব্যক্তি এক সুন্দরী নারীর সাক্ষাৎ পেলো। সে নারীর প্রতি প্রেম নিবেদন করলো। পরীক্ষার জন্য সুন্দরী তাকে বললো:

- আমার পেছনে আমারই এক বোন আছে যার রূপ-লাবন্য আমার চেয়েও বেশি।

লোকটি পেছন দিক তাকালো। আসলে সেদিকে কেউ ছিলো না। মেয়েটি তাকে তিরস্কার করে বললো,

- ওহে আত্ম-দর্শনেচ্ছু! আমি আপনাকে দূর থেকে দেখে ভেবেছিলাম একজন প্রজ্ঞাবান ব্যক্তি; যখন কাছে আসলেন ভাবলাম, হয়তো আপনি প্রেমিক। কিন্তু এখন দেখছি আপনি না কোনো প্রজ্ঞাবান না কোনো প্রেমিক! [সত্যিকার প্রেমিক হলে আপনি পেছন দিকে তাকাতেনই না!]

৩. প্রেমাস্পদের সাথে মিলনাকাঙ্ক্ষার উপায়, উপকরণকে সে সর্বদা মূল্যবান মনে করবে এবং সে হবে আনুগত্যশীল। কারণ প্রেম ও আনুগত্য হচ্ছে প্রেমের নির্যাস।

৪. তার প্রেমাস্পদের সঙ্গে মিলনের পথে বাঁধাদানকারীদের মধ্যে নিজের পুত্রও থাকলে, তার (পুত্রের) ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে।

৫. প্রেমাস্পদের কথা শুনলেই তার মধ্যে জাগ্রত হবে পরিপূর্ণ প্রেমাবেগ ও প্রেমাগ্নি। এতে কোনো কমতি অনুভব করবে না। প্রত্যেকবার প্রেমাস্পদের কথা শ্রবণ করলেই তার মধ্যে অনুভুত হবে অধিক বিরহ ও বিলাস।

৬. প্রেমাস্পদের আদেশ-নিষেধকে সে পুরোদমে মানবে ও সে মুতাবিক কর্ম করবে। কখনো তাঁর নির্দেশের বিরুদ্ধে কিছু করবে না।

৭. যাকিছুর প্রতি সে দৃষ্টি দেবে তা হবে তার প্রেমাস্পদকে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষায়। এতে থাকবে না অন্য কোনে উদ্দেশ্য।

৮. প্রেমাস্পদের প্রতি তার থাকবে অসীম শ্রদ্ধাবোধ।

৯. প্রেমাস্পদের অংশুমালার তাজাল্লির দৃশ্যের সম্মুখে প্রেমিকের দৃষ্টিশক্তি অস্পষ্ট ও ক্ষীণ হয়ে যায়। এ থেকে সৃষ্টি হয় হিংসা, মহাণুরাগ ও ঘর্ম। সে যদি তামকিদের মাক্বামে অবস্থান করে থাকে; আর হালের বেদনা সইতে সক্ষম হয়; এবং মহাবিস্ময়তা রূহের সীমার বাইরে না যায় এবং হৃদয়কে শব্দ ও কর্ম সম্পাদন থেকে বিরত না রাখে- তাহলে, তার রূহ অবলোকন করতে আরো বিস্ময়তার মধ্যে আছে ঠিক যেরূপ তার হৃদয় অপরের সম্মুখে উপস্থিত থাকার ক্ষেত্রে আরো স্পর্শকাতর হয়।

তার মধ্যে যদি এরূপ তামকিনের শক্তি বিদ্যমান না থাকে; এবং পার্থক্যনিধারণের দড়ি এই হালের শক্তির মাঝে তার হাত থেকে কেড়ে নেওয়া হয়, তহলে সে চিৎকার দেয়:

"আমার মধ্যে তোমার প্রতি মহাবিস্ময়তা আরো বাড়িয়ে দাও!"

১০. প্রেমাস্পদের দীদার ও তাঁর সঙ্গে একত্রীকরণ হেতু প্রেমিকের মধ্যকার শওক মুছে যাবে না। বরং প্রতি মুহূর্তের মুশাহাদা ও মিলনের প্রতিটি স্বাদে তার স্বভাবে সৃষ্টি করবে নতুন নতুন শওক, বিস্ময়তা এবং আকাঙ্ক্ষা।

প্রেমাস্পদের নৈকট্য, মহিমময়তার মাত্রা ও দৃষ্টি যতো প্রবল হবে, তার শওক, অস্থিরতা এবং মিলনাকাঙ্ক্ষা ততো বৃদ্ধি পাবে। কারণ প্রোমস্পদের সৌন্দর্য যেমন অসীম; ঠিক তদ্রূপ প্রেমিকের আকাঙ্ক্ষাসমূহও হয়ে যায় অসীম।

মুহাব্বাতের অনেক নিদর্শনের ক'টি মাত্র এখানে বর্ণিত হয়েছে। মুহাব্বাতের পূর্ণাঙ্গ বর্ণনা আদৌ সম্ভব নয়। কারণ শব্দ দ্বারা প্রেমের ব্যাখ্যা কখনো পূর্ণাঙ্গভাবে ফুটিয়ে তুলা যায় না। প্রত্যেকেই নিজেদের হাল মুতাবিক মুহাব্বাতের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ভাষার মাধ্যমে তুলে ধরার চেষ্টা করেন মাত্র।

তেত্রিশতম পরিচ্ছেদ

শওক [আকাঙ্ক্ষা]

শওকের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে:

আনন্দের দাবী হেতু প্রেমাস্পদ কর্তৃক প্রেমিকের হৃদয়ে এক ধরনের আক্রমণ। এর অস্তিত্ব নির্ভরশীল প্রেমিকের আন্তরিকতার ওপর। হযরত আবু উসমান হিরী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "শওক হচ্ছে মুহাব্বাতের ফল; যে আল্লাহর প্রেমে পড়েছে সে তো তাঁর সাথে মিলনাকাঙ্ক্ষায় বিভোর।"

প্রেমের স্তরভেদে শওয়কের ধরন দু'টি:

১. প্রেমাস্পদের সন্তুষ্টি, ক্ষমা ও দয়া হেতু প্রেমিকের মধ্যে শওকের অবস্থা।

২. 'যাতের' প্রেমিকের মধ্যে শওকের অবস্থা যা আসে প্রেমাস্পদের সঙ্গে মিলন ও সম্পর্কের ফলে। এ ধরনের উচ্চ মর্যাদাশীল শওক লাল-সালফার বস্তুর মতো যার মাত্রা অস্তিত্বের মধ্যে অত্যল্প। এর কারণ হলো, সাধারণত মানুষ আল্লাহর দয়ার অনুসন্ধান করে- স্বয়ং আল্লাহকে নয়।

এক অন্তরদৃষ্টিসম্পন্ন (সুফি) বলেন:

তুমি দেখতে পাবে হাজার হাজার:
আবদুর রাহমান - সর্বাধিক দাতার গোলাম,
আবদুর রহীম - সর্বাধিক দয়াবানের গোলাম,
আবদুল করীম - সর্বাধিক উদার প্রভুর গোলাম,
কিন্তু খুবই অল্পজন দেখবে যে:
আবদুল্লাহ্ - আল্লাহর গোলাম।

হযরত বায়িযিদ বিস্তামী রাহিমাহুল্লাহ বলেন:

> আল্লাহর দয়ার আকাঙ্ক্ষীদের সংখ্যা অনেক। অতি অল্পজন আল্লাহর আকাঙ্ক্ষী। আল্লাহর আকাঙ্ক্ষীদের জন্য বেহেশত তাঁরই দৃশ্য, যদিও অদৃষ্ট হেতু তারা দোযখের বাসিন্দা: দোযখ তো তাঁদের জন্য তাঁর নৈকট্য থেকে বঞ্চিত হওয়ার নামান্তর- আর এ বঞ্চিত হওয়া তো অদৃষ্ট হেতু বেহেশতের নিবাসও তাদের জন্য দোযখ।

কোনো কোনো সুফি অবশ্য প্রেমাস্পদের নৈকট্য ও মুশাহাদার স্তরে উন্নীত অবস্থায় শওকের অনুপস্থিতির কথা বলেছেন। তবে সবাই মুশাহাদার অবস্থায়ও প্রেমাস্পদের নৈকট্য লাভ করেন না; যারা (প্রভুর সাথে) সংযুক্তি লাভ করেছেন তাদের সবাই সম্পর্ক লাভ করেন না; যারা নিকটস্থ হয়েছেন তাদের সকলেই সম্পর্কের চূড়ান্ত স্তরে পৌঁছেন না; আর যারা এই চূড়ান্ত স্তরে পৌছেছেন তাদের সবাই স্থায়ীত্ব লাভ করেন নি।

হালের অবস্থায় যখন প্রেমাস্পদের ওপর দৃষ্টি পতিত হয়, তখন শওক মুহূর্তের জন্য শক্তিশালী হয়ে ওঠে। মুশাহাদার মধ্যে শওক (অস্তিত্বাবস্থায়) নিশ্চয়তার নির্যাস। এ জগতে এর অর্জন খুবই কঠিন।

কোনো কোনো স্থানে মৃত্যুর দেরি হেতু শওক আসে; এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে (যেখানে আকাঙ্ক্ষা প্রেমাস্পদের একটি নির্দেশ, এর প্রাপ্তি যেমন স্বয়ং জীবনই) এটা কারণ হয়ে যায় না, কিন্তু এ থেকে পরিত্যাগের কারণ। এরূপ ক্ষেত্রে জীবন হতে পারে প্রেমাস্পদ।

মৃত্যু প্রলম্বিত হওয়ার কারণ (শওকের জন্য) জরুরী নয়; কারণ শওক হচ্ছে 'হাক্কুল ইয়াকীন' এবং অধিগ্রহণের মাক্বাম।

সম্ভবত এ শওকের কারণ হতে পারে মুশাহাদা- যার অর্জন এ জগতে কঠিন।

আরবি 'লিকা' শব্দ 'মুশাহিদা' (উদ্ভাস- প্রভুদর্শন) এবং উসূল (অধিগ্রহণ) এর সঙ্গে সম্পৃক্ত। তবে এ ক্ষেত্রে দ্বিতীয় অর্থটি প্রযোজ্য।

চৌত্রিশতম পরিচ্ছেদ

কাব্জ [সংকোচন] এবং বাস্ত [সম্প্রসারণ]

হাক্বিকাতের পবিত্র পথের মুসাফির যখন মুহাব্বাতে আম এর মাক্বাম অতিক্রম করে এবং মুহাব্বাতে খাস এর মাক্বামে পদার্পণ করে, সে তখন নৈকট্য পায় হৃদয়বান ও প্রভুর হাল ধারণকারীদের। এসময় তার অন্তরে প্রবেশ করে কাব্জ ও বাস্ত এর হাল।

অনুসন্ধান ও প্রত্যাশার এই উভয় অবস্থার মাঝখানে হৃদয়ের অবস্থার পরিবর্তনকারী (আল্লাহ্) তার অন্তরকে এমন করে দেন যাতেকরে সে মহানন্দের অনুভুতিকে উপলব্ধি করে। প্রভু তাঁর নিজের নূর দ্বারা সালিকের হৃদয়কে সম্প্রসারণ করেন।

হাযারাত ওয়াসিতী ও নূরী রাহিমাহুল্লাহ বলেন:

কোনো কোনো সময় কাব্জের শক্ত আঁকড়ানো দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা বান্দার হৃদয়কে মোচড়ে দেন। এর ফলে বান্দার মধ্যে মহানন্দের উপস্থিতি বিলুপ্ত হয়ে যায়- তার চোখ হয় অশ্রুসিক্ত।

কোনো কোনো সময় বাস্তের প্রশস্ত ময়দানে, আল্লাহ তাঁর আঁকড়ানোর ক্ষমতাকে নিজেই কিছুটা শিথিল করেন। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো সালিককে আনুগত্য ও আন্তরিক হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি করে দেওয়া।

কব্জ এর নিদর্শন হচ্ছে:

হৃদয় থেকে 'হায্য' [জয়] নির্গত হওয়া, যাতেকরে আনন্দ মুহূর্তের অবস্থাকে ধরে রাখা সম্ভব হয় (সুরূর)।

বাস্তের নিদর্শন হচ্ছে:

মহানন্দের চমৎকারিত্বের অবস্থায় হৃদয়ের মধ্যে আলোর ঝলকের সৃষ্টি হওয়া।

কব্জ ও বাস্ত এর কারণ যথাক্রমে:

১. প্রথমটি হচ্ছে নফসের গুণাবলীর প্রকাশ এবং আনন্দের চমৎকারিত্বের স্তরের পর্দা। ফলে হৃদয়টি কংকোচ হয়ে যায়।

২. দ্বিতীয়টি হচ্ছে হৃদয়ের ওপর থেকে নফসকে ওঠিয়ে ফেলা। এর ফলে হৃদয়টি সম্প্রসারিত হয়।

নফসের মধ্যেই আছে বাস্তের অনেক পর্দা। এর একটির নাম তুগিয়ান (চরম পাপাচারী)। জয় থেকে অবরোহণের অবস্থায়, হৃদয় নফসকে শ্রবণ করে; এর হাল সম্পর্কে তিরস্কৃত হয়; জয়ের মাধ্যমে আসে পরমানন্দ; এবং এর গতি থেকে সৃষ্টি হয় বিরাট অন্ধকার- স্তরের ওপর স্তর। এ থেকেই আত্মপ্রকাশ করে কাব্জ।

উক্ত বিপর্যয়কে প্রতিহত করতে, হৃদয়ে আনন্দের অবতরণক্ষণে নফসের ওয়াসওয়াসা শ্রবণের পূর্বেই আল্লাহর আশ্রয় কামনা করা চাই। সত্যিকার ফিরে আসা ও আন্তরিকতার মাধ্যমে তাওবাহ করতে হবে। এর ফলে হয়তো তিনি (আল্লাহ্) এটা ও নফসের মাঝখানে পবিত্রতার পর্দা ফেলে নফসকে তুগিয়ানের (চরম পাপাচার) সঙ্গে জড়িত হওয়া থেকে বাঁচিয়ে রাখতে পারেন।

কোনো কোনো সময় নতুন সালিকদের মধ্যে কাব্জের অবস্থার মতো আত্মপ্রকাশ করে দুঃখ-বেদনা এবং বাস্তের অবস্থার মতো অনুভুত হয় মহানন্দ। সুতরাং ‘দুঃখ’ কিংবা ‘আনন্দ’ অনুভব করলেই মনে করতে নেই যে, ‘কাব্জ’ বা ‘বাস্ত’ এর অবস্থা সৃষ্টি হচ্ছে।

কাব্জের (সংকোচনের) শেষ হচ্ছে বাস্তের (সম্প্রসারণের) শুরু। আর বাস্তের শেষ হচ্ছে ফানা (বিলুপ্তি)। ফানার স্তরে কাব্জ ও বাস্ত এর আত্মপ্রকাশ সম্পূর্ণ অসম্ভব।

কাব্জ ও বাস্তের পরিবর্তে যথাক্রমে:

১. প্রথামিক সালিকদের মধ্যে সৃষ্টি হয় 'খাওফ' (আল্লাহভীতি) এবং 'রিজা' (আল্লাহভরসা)।

২. শেষের স্তরের সালিকদের মধ্যে সৃষ্টি হয় 'ফানা' (বিলুপ্তি) ও 'বাকা' (স্থায়িত্ব)।

প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের সালিকদের সঙ্গী হয়:

১. ঈমানের স্তরভেদে ভয় ও আশা।

২. স্বভাবের স্তরভেদে দুঃখ ও আনন্দ।

অস্তিত্বের বস্ত্রাবৃত শেষের স্তরের সালিকীনের মধ্যে না আছে কাব্জ কিংবা বাস্ত; না আছে ভয় কিংবা আশা; না আছে দুঃখ, না আছে আনন্দ। এগুলো একমাত্র ঐ অবস্থায় আত্মপ্রকাশ করে যখন হৃদয়ের স্তর নেমে আসে নফেসর মধ্যে। আর এই নফসেই হৃদয়ের গুণাবলী প্রকাশ পায়। এ অবস্থায়ই দুঃখ ও আনন্দ যথাক্রমে সংকোচন (কাব্জ) ও সম্প্রসারণে (বাস্ত) পরিবর্তিত হয়। এভাবেই কাব্জ ও বাস্ত নফসের মধ্যে স্থায়িত্ব লাভ করে, আর কখনও সরে না।

পয়ত্রিশতম পরিচ্ছেদ

ফানা [বিলুপ্তি] ও বাকা [স্থায়িত্ব]

'ফানা' হলো আল্লাহ পর্যন্ত ভ্রমণের শেষ স্তর।

'বাকা' হলো আল্লাহতে ভ্রমণের স্তর।

আল্লাহ পর্যন্ত ভ্রমণ (ফানা) তখনই শেষ হয় যখন আন্তরিকতার দৃঢ়পদে পবিত্র মুসাফির (সালিক) অস্তিত্বের মরুভূমিতে ভ্রমণ শুরু করেন।

আল্লাহতে ভ্রমণ (বাকা) তখনই নিশ্চিত হয় যখন পূর্ণাঙ্গভাবে ফানার স্তরে পতিত হওয়ায় বান্দাকে (সালিককে) দান করা হয় এমন এক পবিত্র অস্তিত্ব যাতে দুষণ বা অপবিত্রতার লেশমাত্র নেই। সুতরাং, বর্ণনানির্ভর জগতে (বস্তুজগতে) পবিত্র এ ভ্রমণকারী ঐশী গুণাবলীসহ অগ্রসর হতে থাকে।

'ফানা' ও 'বাকা'র স্বরূপ বর্ণনার মধ্যে মাশাইখে কিরামের মাঝে মতানৈক্য দেখা যায়। অনুরূপ পবিত্র ভ্রমণকারীদের হালের বর্ণনা দিতে যেয়েও তাঁরা বিভিন্নভাবে বর্ণনা দিয়েছেন। অবশ্য এরূপ হওয়ার মূল কারণ হচ্ছে বর্ণনাকারী শায়খের নিজস্ব হাল ও উপলব্ধি। আর প্রত্যেকের ক্ষেত্রে এ দু'টো অনুরূপ হয় না। মুরীদের হালভেদে শায়খ ফানা ও বাকার ব্যাখ্যা দিয়েছেন। মতানৈক্যের এটাও একটি কারণ।

অধিকাংশ মাশাইখে কিরাম 'ফানা' ও 'বাকা'র বর্ণনা যেভাবে দিয়েছেন তার একটি টেবিল তুলে ধরা হলো:

ফানার নিদর্শন:	বাকার নিদর্শন:	অনুভবের জন্য জরুরত:
১. ফানার মতানৈক্যতা	বাকার মতানৈক্যতা	তাওবাহে নাসূহার মাক্বাম
২. জাগতিক আনন্দকে বিসর্জন	পরজগতের আনন্দের মধ্যে স্থায়িত্ব	জুহদের মাক্বাম
৩. ইহ ও পরজগতের আনন্দকে বিসর্জন	আল্লাহর মধ্যে আনন্দের স্থায়িত্ব	স্বভাবিক প্রেমের মধ্যে আন্তরিকতার মাক্বাম
৪. দোষনীয় গুনাবলীর বিসর্জন		

'ফানা'র প্রকার দু'টি: বহির্গামী ও অন্তর্গামী:

১. বহির্গামী ফানা:

এটা হচ্ছে আমলের ফানা। এটা ঐশী আমলের অন্তর্ভুক্ত। এরূপ ফানার অধিকারী ঐশী আমলের মধ্যে এতোই ঢুবে থাকেন যে, তিনি নিজে কিংবা অপর কেউ তার আমল, ইচ্ছা, আকাঙ্ক্ষা ইত্যাদি দেখতেই পান না। একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই তার আমলকে দেখতে পারেন। এ আমল শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য হয়ে থাকে। অনেক সালিক এই মাক্বামেই অবস্থান করে জীবন কাটিয়েছেন।

২. অন্তর্গামী ফানা:

এটা হচ্ছে সিফাত (গুণাবলী) ও যাতের ফানা। এই হালের অধিকারী ব্যক্তি আল্লাহর সিফাত ও যাতের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয়ে যায়। আল্লাহর যাতের মধ্যে ফানা হওয়ার অর্থ হচ্ছে 'উযূদের' যাতে ফানা [ওয়াহদাতুল উযূদ - চূড়ান্ত ও চিরন্তন একক অস্তিত্ব, আল্লাহ]] হওয়া। এই ফানার মধ্যে সালিক ঐ সময় পর্যন্ত বিলুপ্ত থাকেন যতক্ষণ না তিনি (পুনরায়) আল্লাহর অস্তিত্ব দ্বারা চেতনালাভ করেন। ঐ সময় তিনি পবিত্র ও কলুষমুক্ত হৃদয়ের অধিকারী হোন। তার না থাকে কোনো লোভ না কোনো দুশ্চিন্তা।

আল্লাহ এ ব্যাপারে পূর্ণ জ্ঞাত যে, কেউ যদি ফানার স্তর অতিক্রম করে না থাকে তাহলে তার জন্য বাকার স্তর হচ্ছে শিরক। অপরদিকে ফানার স্তর অতিক্রমকারী যখন বাকার স্তরে উপনীত হবে তখন সে কিছুতেই শিরকে পতিত হবে না। অন্যকথায়, ফানার পরে বাকা- এ তরতীবের বিপরীত হয় না।

ফানার মাক্বামে উপনীত সালিককে **'অপ্রকৃতিস্থ'** [সম্পূর্ণ বেখবর] থাকাটা মোটেই শর্ত নয়। কেউ এ অবস্থায় থাকলে থাকতেও পরে। অপররা না-ও থাকতে

পারে। ফানা নিয়ন্ত্রিত থকতে পারে। সালিকের অভ্যন্তর (হৃদয়) ফানার মধ্যে নিমজ্জিত থাকাসত্ত্বেও বাহ্যিক ও দৈহিকভাবে তিনি জগতের সবকিছু অবলোকন ও কর্মক্ষম হতে পারেন।

সময় সময় এটাও হতে পারে যে, তিনি যাত ও সিফাতের প্রকাশ অবলোকনের মাক্বামে অবস্থান করছেন; এবং ফানার হালের অপ্রকৃতিস্থতা থেকে প্রকৃতিস্থতায় ফিরে আসছেন। তিনি হচ্ছেন ঐ ব্যক্তি যিনি ফানার হালের শুরুতে মাতাল অবস্থার অনুভুতিকে পর্দাবৃত করেন।

বসরার একটি মসজিদে মুসলিম বিন ইয়াসির রাহিমাহুল্লাহ নামাযরত ছিলেন। হঠাৎ মসজিদের একটি পিলার ধ্বসে পড়লো। আশপাশের লোকজন এমনকি অদূরবর্তী বাজারের মানুষ সবাই এ ব্যাপারে ওয়াকিফহাল থাকলেও মুসলিম রাহিমাহুল্লাহ কিছুই বুঝতে পারলেন না। এটার নামই হচ্ছে হালের অবস্থায় অপ্রকৃতিস্থ থাকা।

বহির্গামী ফানাকে সমর্থনকারী বাকা হচ্ছে এই:
ইচ্ছা ও আকাঙ্ক্ষার ফানার শেষে আল্লাহ তাঁর বান্দাকে ইচ্ছাশক্তি ও আকাঙ্ক্ষার নিয়ন্ত্রক বানিয়ে দেন। যাকিছু তিনি ইচ্ছা করেন তা হয় আল্লাহর ইচ্ছা।

অন্তর্গামী ফানাকে সমর্থনকারী বাকা হচ্ছে এই:
যাত ও সিফাতের ফানা দ্বারা যাবতীয় পর্দা উন্মোচন হয়। বান্দার নিকট প্রভু যেমন তাঁর সৃষ্টির জন্য পর্দা নন; তদ্রূপ সৃষ্টিও প্রভুর সম্মুখে পর্দা নয়। শুধুমাত্র ফানার মাক্বামে স্থির সালিকের জন্য আল্লাহ হচ্ছেন তাঁর সৃষ্টির পর্দা। অপরদিকে যারা ফানার স্তরে উন্নীত হন নি, তাদের জন্য সৃষ্টি হচ্ছে আল্লাহর পর্দা।

ফানার পরে, বাকার স্তরে উন্নীত ব্যক্তি দর্শন করে প্রতিটি পর্দা তার নিজস্ব মাক্বামে। এখানে থাকে না এক পর্দা (সৃষ্টিকর্তার পর্দা) ওপর পর্দা (সৃষ্টির পর্দা) দ্বারা আবৃত। বান্দার মধ্যে একাত্রিত হয় ফানা ও বাকা উভয়টি। ফানাতে তিনি বাকী (স্থায়ী) এবং বাকাতে তিনি ফানী (বিলুপ্ত)।

ছত্রিশতম পরিচ্ছেদ

আওরাদ [উপাসনা]

তরীকতের সালিক গোধূলির [তাহাজ্জুদের] পূর্বে উযু সেরে নেবেন। এরপর ক্বিবলামুখী হয়ে দাঁড়িয়ে তাহাজ্জুদের নামায আদায় করবেন। নিয়মিত জিকির করবেন ফযরের আযান ধ্বনিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত। এরপর নিম্নে বর্ণিত উপায়ে প্রত্যেক ওয়াক্তের আযানের জবাব ও দুআ শেষে একান্ত মনোযোগসহ দু’আ করবেন:

ফযরের আযান শেষে: “হে আল্লাহ! আপনার আজকের এ দিনের শুরু এবং পেছনে চলে যাওয়া রাতের অবসান হলো। ডাক পড়লো আপনার উপাসনার। হে ক্ষমাশীলদের ক্ষমাশীল! আপনার ক্ষমাসুন্দর দয়ার দ্বারা আমাকে ক্ষমা করে দিন। ক্ষমা করুন আমার মাতাপিতা, সকল মু’মিনদেরে- পুরুষ ও নারী।”

ভোরবেলা সালিক আল্লাহর দিকে ধ্যানসহ কালিমা শাহাদাত পাঠ করবেন। এরপর বলবেন: “স্বাগত! হে কিরামান কাতিবীন ফিরিশতাদ্বয়! আল্লাহ আপনাদেরে অনুগ্রহ করুন। দয়া করে আমার আমলনামায় লিখুন:

“লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ। মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। বেহেশত সত্য। দোযখ সত্য। পুলসিরাত সত্য। মুনকার নকীরের প্রশ্নসমূহ সত্য। মিযানের পাল্লা সত্য। হাশরের হিসাব-নিকাশ সত্য। আল্লাহর শাস্তি সত্য। আল্লাহর প্রতিদান সত্য। আমলনামা সত্য। হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শাফায়াত সত্য। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে: নির্দিষ্ট সময় উপস্থিত হলে, আল্লাহ তা’আলা সকল মৃতদেরে কবর থেকে পুনরুজ্জীবিত করবেন। হে আল্লাহ! শেষ বিচারের বিপদের সময়ের জন্য আমি শুধু আপনার নিকট এই সাক্ষ্যনামা আমানত হিসেবে রেখে দিলাম। হে আল্লাহ! এটার ওয়াসিলায় আমার গুনাহ-খাতা মাফ করুন। গুনাহ করা থেকে রক্ষা

করুন। আমার মিযানের পাল্লাকে নেকি দ্বারা ভারী করুন। আমাকে নিরাপত্তা দিন। আপনার করুণা দ্বারা আমায় মাফ করুন। হে করুণাময়! হে রাহমানুর রাহীম! হে আল্লা-হ!”

এরপর ফযরের দু’রাকাআত সুন্নাত পড়বেন। প্রথম রাকাআতে সূরা ফাতিহার পর সূরা কাফিরুন ও দ্বিতীয় রাকাআতে সূরা ফাতিহার পর সূরা ইখলাস পাঠ করবেন।

মসজিদে যাওয়ার পথে দুআ করবেন: “হে আল্লাহ! আপনার আনুগত্যশীল বান্দাদের ওয়াসিলায়; আপনার ফকির-দরবেশদের ওয়াসিলায়, আমার এই যাওয়া-আসার মাধ্যমে আমি আপনার নিকট প্রার্থনা করছি, হে আল্লাহ্! পাপকার্য ও মুনাফিকী থেকে পানাহ চাচ্ছি; আপনার অভিসম্পাত থেকে বাঁচতে ও অনুগ্রহ পাওয়ার আশায় আমি বের হয়ে এসেছি; দোযখের আগুন থেকে রক্ষা পেতে ও গুনাহখাতা থেকে মাফি পেতে আমি আপনার উপাসনা করি- আর আপনি ছাড়া গুনাহখাতা মাফ করার আর কেউ নেই।”

এরপর মসজিদে প্রবেশ ও বের হওয়ার দুআ; প্রবেশের সময় আগে ডান পা ঢুকানো ও বের হওয়ার সময় আগে বাম পা বের করা ইত্যাদি আমল করবেন।

সম্ভব হলে ফযরের নামায শেষে ইশরাকের সময় পর্যন্ত মসজিদে বসে দুআ, দরূদ, জিকির-আজকার ও কুরআন তিলাওয়াত করবেন। এরপর ইশরাকের নামায আদায় করবেন।

ফযরের পর তিলাওয়াত করবেন: সূরা ফাতিহা; সূরা বাক্বারার (২) ১-৫, ১৬৪-১৬৫, ২৫৫-২৫৭ এবং ২৪৮-২৮৬ নাম্বার আয়াত; সূরা আলে-ইমরানের (৩) ১৮-১৯, ২৬-২৭ এবং ১৯০-২০০ নাম্বার আয়াত; সূরা কাহাফের (১৮) ১০৭-১১০ নাম্বার আয়াত; সূরা হাদীদের (৫৭) ১-৬ নাম্বার আয়াত; এবং সূরা হাশরের (৫৯) ২১-২৪ নাম্বার আয়াত।

প্রত্যেক নামাযের পর পাঠ করবেন ৩৩ বার সুবহানাল্লাহ [মহিমা আল্লাহর প্রতি], ৩৩ বার আল-হামদুলিল্লাহ [যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহর জন্য], ৩৩ বার আল্লাহু আকবার [আল্লাহ মহান] ও ১ বার লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ [আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই]।

আমল দু'প্রকারের:

১. বাহ্যিক। যেমন: নামায, জিকির, তিলাওয়াতে কুরআন, ইসমে জাত ও সিফাত বার বার উচ্চারণ করা।

২. অভ্যন্তরীণ। যেমন: জিকিরে খফি, মুহাজিরা [আল্লাহর সম্মুখে উপস্থিত থাকা], মুরাকিবা [ভয়সহ ধ্যানস্থ হওয়া], মুহাসিবা [আমলের হিসাব করা]।

উপরোক্ত তরতীবে আমল করা উত্তম। বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ আমলকে একত্রিত করতে চেষ্টা চালানো উচিৎ। সালিককে নামায, তিলাওয়াত ও জিকিরের মধ্যে ডুবে থাকতে হবে। এসব আমল করার সময় অন্তরে আল্লাহর উপস্থিতি [মুশাহিদা] ও তাঁর প্রতি ভয় রাখা চাই।

'**মুরাকিবা**' হচ্ছে ধ্যানের অবস্থা, যেখানে সালিক একমাত্র আল্লাহকেই সর্বাবস্থায় ও সর্বদা তার সংরক্ষক ও দর্শক ভাববে। আর এটাই হচ্ছে জিকিরের নির্যাস।

মুরাকিবার ক্ষেত্রে সালিক যদি অলসতা অনুভব করে; এবং প্রলোভন ও ভিন্নচিন্তা শক্তিশালী হয়ে ওঠে, তাহলে উচিৎ হবে নিদ্রার মাধ্যমে বিশ্রাম গ্রহণ করা। এতেকরে নফেসর ওপর থেকে নির্যাতন ও দুর্বলতা দূর হবে। সে পুনরায় আমলের প্রতি আকর্ষণ বোধ করবে। নফসকে এভাবে মাঝে-মধ্যে বিশ্রামের সুযোগ না দিলে যন্ত্রণা হেতু সে বিভ্রান্তিমূলক কল্পনা অন্তরে ঢুকিয়ে দেবে; বিভিন্ন অভিযোগ উত্তাপন করবে; আমল করা কঠিন করে তুলবে।

রাতে নিদ্রা যাওয়ার পূর্বে সালিককে অযু করতে হবে। তাহাজ্জুদের সময় ঘুম থেকে জেগে ওঠে নিয়মিত তাহাজ্জুদের নামায আদায় করতে হবে।

সাইত্রিশতম পরিচ্ছেদ

রুইয়াত [আল্লাহদর্শন]

সুস্পষ্টভাবে আল্লাহদর্শন:

(ক) ইহজগতে সম্ভব নয়, 'ফানি'র মধ্যে 'বাকি' নেই।

(খ) পরজগতে ঈমানদারদের জন্য খাস। তবে কাফিরদের জন্য নিষিদ্ধ।

ঈমানদাররা (মুসলমানগণ) আল্লাহকে দেখে:

(ক) ইহজগতে, ঈমানের নেত্রে ও ধ্যানস্থাবস্থায় ক্ষণস্থায়ী পলকের মাধ্যমে।

(খ) পরজগতে, দৃষ্টির পলক ও ধ্যানের মাধ্যমে (হাদিসের বর্ণনানুযায়ী)।

সত্যিকার ঈমানের হাক্বিকাত হচ্ছে এই:

নিজের বিশ্বাসে ঈমানদার ব্যক্তি ইয়াকিনের স্তরে পৌঁছেছে।

ইহজগতে লোকজন:

(ক) ইলমে ইয়াকিনের মাধ্যমে জানে; এবং তাদের আইনুল ইয়াকিন হচ্ছে পরজগতের জন্য প্রতিশ্রুত।

(খ) 'আইনুল ইয়াকিনে'র মাধ্যমে দেখেন; এবং 'হাক্কুল ইয়াকিন' হচ্ছে পরজগতের জন্য প্রতিশ্রুত।

এ জন্য বলা হয়: ''আমার অন্তর মাঝে, আমার প্রভুকে আমি দেখেছি।''

এটাই হচ্ছে ঈমান। হযরত মু'আয রাদ্বিআল্লাহু আনহু সাহাবায়ে কিরামের দরোজার সামন দিয়ে যাত্রা করতেন এবং বলতেন:

''এতে করে আগামী এক ঘন্টার জন্য 'ঈমানদার' হতে পারি।''

'আইনুল ইয়াকিন' যখন পূর্ণতা লাভ করে তখন এটার মধ্যে দৃষ্টিশক্তির সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায়। হযরত আলী ইবনে আবি তালিব রাদ্বিআল্লাহু আনহু এই মাক্বামের অবস্থা বর্ণনা করতে যেয়ে বলেন:
"সকল পর্দাও যদি ফেটে যায়, সবগুলোই আমার ইয়াকিনকে বৃদ্ধি করবে না।"

একদল লোক পরজগতে আল্লাহর দর্শনকে অস্বীকার করে; তারা দু'টি ক্ষেত্রে ভুল করেছে:

(১) তারা বুঝেনি আল্লাহর বাক্য: "তিনি, যাকে চোখ বুঝতে পারে না।"
(২) পরজগতকে ইহজগতের সঙ্গে তুল্য মনে করে।

উপরের প্রথম কথাটি (১) সম্পর্কে ব্যাখ্যা হচ্ছে: 'দেখা' এক জিনিষ (যা সম্ভাব্য), কিন্তু বুঝা আরেক জিনিষ (যা কঠিন)। সূর্যের আকার যে কোনো ব্যক্তি দেখতে পারে; কিন্তু একে বুঝা কঠিন ব্যাপার।

দ্বিতীয় কথাটি (২) সম্পর্কে ব্যাখ্যা হচ্ছে: ইহজগতকে 'দেখা'র সাথে পরজগতকে 'দেখা'র মধ্যে কোনো সম্পর্ক বা সামঞ্জস্য নেই। 'ফানি' ও 'বাকি'র মধ্যে কী সম্পর্ক থাকতে পারে?

ভুলটি হচ্ছে এখানে: তারা ভেবেছে, এ জগতে দেখা যেরূপ পরজগতেও তা-ই। কারণ, দেখার জন্য নিচের ৫টি শর্ত জরুরী:

১. একটি দিক, ২. একটি স্থিতি (স্থান), ৩. একটি বর্ণনা (আকৃতি), ৪. একটি গুণ (রঙ, রূপ, শক্ত, নরম, ভারী ইত্যাদি) ও (৫) একটি আলোকের বেষ্টনী (আলোক-প্রতিবিম্বতা)।

পরকালের ক্ষেত্রে এসব শর্ত থাকা ভ্রম ধারণা। আরো বড়ো ভুল হচ্ছে তারা নিজের হাল ও মাক্বামের সঙ্গে উচ্চতর হাল ও মাক্বামের তুলনা করে কৃত্রিম স্ববিরোধিতার সৃষ্টি করছে।

তিনি (আল্লাহ) হচ্ছেন:

(ক) হৃদয়ে, পরজগতে, গুপ্ত জগতে, কুদরতে।

(খ) দেহে, ইহজগতে, শাহাদতের ও হিকমাতের জগতে।

উপরোক্ত দল আমল করে নগদ প্রাপ্তির জন্য, এবং তারা একে কর্জ দিতে নারাজ। অপরের জন্য যা আগামীতে দর্শনের [দেখার] প্রতিজ্ঞা, তাদের জন্য তা আজকের নগদ।

এরপরও তাদের জন্য এটা একটি প্রতিজ্ঞা, যা হচ্ছে পরজগতে অপরদের জন্য নগদ। নগদ সকল সঞ্চয় রক্ষাকারীর রক্ষকের নিকট পৌঁছে যায়।

ওলিদের প্রতিজ্ঞা হচ্ছে নবীদের নগদ। আর ঈমানদারদের (মুসলমানদের) প্রতিজ্ঞা হচ্ছে ওলিদের নগদ।

স্বীয় হালের ভিত্তিতে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রতিজ্ঞা দেওয়া হয়েছে একটি মাক্বাম; এর বৈশিষ্ট্য হলো "মাক্বামে মাহমূদ" - প্রশংসিত মাক্বাম।

এই মাক্বামে তাঁর সঙ্গে কেউ অংশীদার নয়। এখানে ঈমানের মধ্যে আমন্ত্রণ জানানোর বৈশিষ্ট্য ফুটে ওঠেছে। আর এখানে কথা বলছেন কালামে মজীদের আয়াত নাজিলকারী (আল্লাহ তা'আলা)।

আটত্রিশতম পরিচ্ছেদ

মা'রিফাতে দিল [হৃদয় সম্পর্কে গভীর জ্ঞান]

হৃদয়ের গুণাবলী সম্পর্কে মা'রিফাত (জ্ঞান) লাভ খুব কঠিন। এর ব্যাখ্যা অস্পষ্ট হওয়ার কারণ:

'হালের' মধ্যে এর শক্তির স্থায়িত্ব; এবং পূর্ণতালাভের ক্ষেত্রে এর উন্নতির মাত্রা।

এ কারণেই একে (হৃদয়কে) তাঁরা [সুফিরা] বলেন:

১. ক্বাল্ব - হৃদযন্ত্র।

২. কুল্লাব - একটি প্রতারক।

'হাল' যেহেতু আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি উপহার- আর সীমাহীন তাঁর উপহার, তদ্রূপ ক্বালবের শক্তি, উন্নতির মাত্রা ও আরোহণ ইত্যাদিও সীমাহীন।

হৃদয়ের সীমাবদ্ধতার সংখ্যায় আবদ্ধ নয় তার হাল ও গুণাবলী। 'মারিফাতে দিলে'র মহাসাগরে হাজার হাজার ডুবুরি ডুব দিয়েছেন। এর তলদেশে কেউ পৌঁছেন নি। অথচ কেউ কিন্তু অস্বীকার করেন নি- এর বিরলতা ও বিস্ময়তা।

'দিল' (হৃদয়) এর অর্থ হলো, অস্তিত্বের চক্র গতিশীল হওয়া এবং এখানে এসে পূর্ণতা লাভ। এরই সঙ্গে যুক্ত আছে অসীমত্বের রহস্য। যার কোনো শুরু নেই। এতেই নিহিত, দৃষ্টিশক্তির (অন্তর্দৃষ্টি) সূত্র- যেখান থেকেই মাহাত্ম্যের উৎপত্তি।

'বাকি'র বৈশিষ্ট্যের সৌন্দর্য ও বিরাটত্ব; ক্ষমাশীলের কুরসি; কুরআন ও ফুরক্বানের স্তর; অস্তিত্বের উপস্থিতি ও অস্তিত্বের অনুপস্থিতি 'বারযাখ'; রূহ ও নফস্;

মহাসগর ও প্রভুত্ব; বাদশাহর পর্যবেক্ষক ও পর্যবেক্ষণ; প্রভুর প্রেমিক ও প্রেমাস্পদ; প্রভুর সৌন্দর্যের রহস্যাবলীর ভর বহন- এ সবই দিলের গুণাবলী।

'রূহ' ও 'নফস্' এর মধ্যে মিথস্ক্রিয়ার কারণ হচ্ছে দিল (অন্তর)। দিলই হচ্ছে প্রভুর রাজত্ব ও রাজকীয়তা বিকাশ, প্রতিবিম্ব, দৃষ্টি এবং মুশাহাদার স্থল।

দিলের আকার ধারণায় আসে প্রেমের নির্যাস দ্বারা। এর দৃষ্টিশক্তি ঔজ্জ্বল্যতা লাভ করে মুশাহাদার আলোকে।

নফস যখন রূহ থেকে মুক্ত থাকে, তখন উভয় দিকে প্রেম ও কলহ আত্মপ্রকাশ করে। উভয়ের (রূহ ও নফেসর) মিথস্ক্রিয়া হেতু জন্ম নিয়েছে দিলের (হৃদয়ের) আকার। আলমে বারযাখের মতো, এই মিথস্ক্রিয়া রূহ ও নফেসর মহাসাগরের মধ্যে মধ্যস্থতা করে। শিথিল করে উভয়ের মধ্যস্ত বিঘ্নিতাবস্থাকে।

প্রেম থেকেই যে দিলের স্বরূপ আত্মপ্রকাশ করে তার প্রমাণ হলো:

যে কেউ কোনো সৌন্দর্য দর্শন করে, দিলের মাধ্যমেই একে সে দেখে; যখনই কেউ কোনো সাথী খুঁজে পায়, দিলের দ্বারাই তাকে জড়িয়ে ধরে।

দিল কখনো নয়: নির্বাচিতজন ছাড়া, প্রেমাস্পদ বিহীন, না কোনো হৃদয়-অলঙ্করণকারী ছাড়া। এর মূল শক্তভাবে প্রোথিত প্রেমের মাঝে। আর প্রেমের অস্তিত্বও হৃদয়ের ওপর নির্ভরশীল।

রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ক্বলব (দিল) চার ধরনের:

১. ঐ ক্বলব যা পবিত্র, নূরান্বিত, যেখানে বাতি জ্বলন্ত। এ ক্বলবের অধিকারীরা হলেন ঈমানদার মুসলমান।

২. ঐ ক্বলব যা অন্ধকারে নিমজ্জিত, নিম্নমুখী। এটা হচ্ছে কাফিরদের ক্বলব।

৩. ঐ ক্বলব যা কুফর ও ঈমানের মাঝখানে সন্দেহবাদে নেশাগ্রস্ত। এটা হচ্ছে মুনাফিকদের ক্বলব।

৪. এমন ক্বলব্ যার একদিকে ঈমান ও অপরদিকে মুনাফিকী বিদ্যমান। এর ঈমানের দিকে ঐশি জগতের ছোঁয়া এবং মুনাফিকীর দিকে কলুষিত জগতের আবর্জনা- যা যখমের পুঁজের মতো। এ উভয় দিকের যে দিকটি শক্তিশালী, সেটাই ব্যক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করে।

উপরোক্ত চার প্রকার হৃদয়ের মধ্যে পার্থক্যের সূত্র হচ্ছে, রূহ ও নফেসর মধ্যকার কলহ।

রূহ সর্বদাই নিজের জগতে নফসকে ধাবিত করতে সচেষ্ট। অপরদিকে নফসও সর্বদা নিজের জগতের দিকে রূহকে নিয়ে যেতে সক্রিয়। এই দ্বন্দ্ব চলছে প্রতিনিয়ত। কোনো সময় রূহ এ লড়াইয়ে জিতে যায় এবং নফসকে নিম্ন-মধ্যম স্থান থেকে নিয়ে যায় উত্তম মাক্বামে। কোনো সময় নফস জিতে যায় লড়াইয়ে এবং রূহকে নামিয়ে আনে পূর্ণতার শিখর থেকে ক্ষতির গহ্বরে।

উপরোক্ত উভয় দিকের যেদিকটি ঝগড়ায় বিজিত হবে, সেটির প্রতিই হৃদয় আনুগত্যশীল থাকবে। একে অনুসরণ করে হৃদয় সন্তুষ্ট হয়। তবে এ উভয় আকর্ষণের কোনটি বেছে নিয়েছে তার ওপরই নির্ধারণ করে বান্দাহর চিরন্তন সুখ বা যন্ত্রণার। বান্দাকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, রূহের আকর্ষণ হক্ব এবং নফসের আকর্ষণ বাতিল। ঈমানের আলোকে এ সত্যকে গ্রহণ করে বান্দাকে সর্বদা নফেসর বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে। আর এ লড়াইয়ের নামই ‘**তাযকিয়ায়ে নফস**’।

যদি রূহের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করে অশেষ চিরন্তন সুখ ও চিরন্তনের দয়া, তাহলে এটি শক্তিশালী হবে; বিজয় আসবে নফেসর ওপর; সংগ্রাম থেকে মুক্ত হবে;

উন্নীত হবে অবরোহণগামী সৃষ্টি থেকে আরোহণগামী কিদামে; এবং পূর্ণাঙ্গভাবে ‘নফস’ ও ‘ক্বলব’ থেকে দৃষ্টি ঘুরিয়ে আল্লাহর মুশাহাদার দিকে ধাবিত হবে। তখন দিল (অন্তর) ক্বল্বের মাক্বামকে অনুসরণ করার মাধ্যমে আরোহণ করবে রূহের মাক্বামে। এবং রূহের অবস্থানস্থল হবে তারও অবস্থানস্থল।

এরপর নফস দিলকে অনুসরণ করার মাধ্যমে তার বাসস্থান (বাহ্যিক জগত) থেকে দিলের (আর দিল হলো নফেসর পিতা) মাক্বামে উন্নীত হবে।

এটাই হচ্ছে ঈমানদারের দিল- যেথায় জাররা পরিমাণও শিরক কিংবা কুফরের স্থান নেই।

অপরদিকে, যদি নফস রূহের ওপর বিজয়ী হয়ে যায়, তাহলে রূহ তার উচ্চ মাক্বাম থেকে ক্বল্বের মাক্বামে অবরোহণ করে। আর ক্বল্বও তার স্বীয় মাক্বাম থেকে অবরোহণ করে নফেসর মাক্বামে। নফস তখন স্বভাবের মৃত্তিকায় নিজেকে শক্তভাবে প্রোথিক করে রেখে দেয়।

এটাই হচ্ছে কাফিরদের দিল- যাদের অন্তর নিম্নস্তরে; কুফরের অন্ধকার দ্বারা কৃষ্ণকায়; পূর্ণাঙ্গভাবে পাকড়াও অবস্থায়।

যদি পূর্ণাঙ্গ বিজয় কোনো দিকেই নিশ্চিত না হয়, দিল সাধারণত নিচের যে কোনো একদিকে ঝুঁকে পড়বে:

১. নফসের দিকে- যদি নফস শক্তিশালী থাকে ও দিল মধ্যখানে থেকে সিদ্ধান্তহীনতায় নিমজ্জিত হয়।

২. রূহের দিকে- যদি রূহ শক্তিশালী থাকে।

এটাই হচ্ছে দ্বিমুখী কাত-হওয়া দিল। এর এক মুখ ঈমানের দিকে ও অপর মুখ মুনাফিকীর দিকে।

উনচল্লিংশ পরিচ্ছেদ

মা'রিফাতে মুরীদ, মুরাদ, সালিক ও মাজযূব

মুরীদ: অনুসরণকারী, প্রেমিক, শিষ্য।
মুরাদ: অনুসরণীয়; প্রেমাস্পদ, শায়খ।
সালিক: তরীকতের রাস্তায় ভ্রমণকারী।
মজযূব: আকর্ষিত জন।

মুরীদকে মুক্তাদী বা অনুসরণকারী বলা হয় এজন্য যে:

তার চোখের দৃষ্টি প্রখর ও আলোকিত হয় প্রদর্শনকারীর (মুর্শিদের) দিকনির্দেনার নূরে। ফলে মুরীদ তার নিজের দোষত্রুটির প্রতি দৃষ্টিপাত করতে সক্ষম হয়। পূর্ণতাপ্রাপ্তির ইচ্ছার অগ্নি তার স্বভাবে প্রজ্জ্বলিত হয়। সে মুরাদ (মুর্শিদের) ও প্রভুর (রবের) নৈকট্য লাভে বিভোর হয়ে পড়ে।

আকাঙ্ক্ষী ব্যক্তির ভ্রমণের প্রতি আকর্ষিত হয়ে, মুরীদ আল্লাহ ও মুরাদ ছাড়া ইহ ও পরজগতে আর কিছুই চায় না। তার জন্য স্বয়ং ইচ্ছাও অস্পষ্ট হয়ে ওঠে।

এরূপ কথাই বলেছেন হাযারাত শায়খ আবদুল্লাহ হাফিজ ও শায়খ আবু উসমান হিরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিমা।

মুরাদকে মুক্তাদা (অনুসরণীয়) বলা হয় এজন্য যে:

মুরীদের ওপর তাঁর নিয়ন্ত্রণ এ পর্যায়ে পৌঁছুয়েছে যে, তিনি অপূর্ণতাকে পূর্ণতা দান করতে পারেন; নিজের দৃষ্টিপাত দ্বারা মুরীদকে সঠিক পথের দিক-নির্দেশনা প্রদান করতে সক্ষম।

মুরাদ বা পবিত্র রাস্তার ভ্রমণকারী হচ্ছেন মজযূব (আকর্ষিত ব্যক্তি), যিনি ভ্রমণপথে অনুভবের গুণাবলীর সকল মরুভূমি ও বিপৎসঙ্কুল স্থানসমূহ অতিক্রম করেছেন। এরপর ঐশি আকর্ষণের সাহায্যে ক্বলবের স্তর পেরিয়ে আরোহণ করেছেন রূহের স্তরে। এরপর কাশফ ও ইয়াকিনের দরোজা পার হয়ে স্থিত হয়েছেন প্রভুর মুশাহাদার উচ্চতর মাক্বামে।

অথবা তিনি, আল্লাহর আকর্ষিত ব্যক্তি (মজযূব ইলাল্লাহ)। একজন পবিত্র রাস্তার ভ্রমণকারী, যিনি প্রথমে প্রভুপ্রেমের আকর্ষণে বিভোর হয়ে মাক্বামসমূহের প্রান্তর অতিক্রম করেছেন; পৌঁছুয়েছেন ঐশি জগতে ও মুশাহাদার স্তরে; এরপর ভ্রমণের পদব্রজে স্থিত হয়েছেন স্তর ও স্থিতির স্থানসমূহে। এরপর ইলমের মাঝে আহরণ করেছেন হাক্বিকাতের হাল।

উপরোক্ত উভয় (মজযূব) ব্যক্তি ‘শায়খ’ [মুর্শিদে কামিল] হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেছেন। তাঁরাই হচ্ছেন ‘মুকতাদা’ (অনুসরণীয়)।

নিচের দুজনের কেউই শায়খ হওয়ার মর্যাদায় উন্নীত হন নি:

১. অপূর্ণ পবিত্র রাস্তার ভ্রমণকারী, যিনি সীরাতুল মুস্তাকীমের ওপর প্রতিষ্ঠিত থেকে প্রকাশের প্রান্তরে উপনীত হন নি।

২. অপূর্ণ আকর্ষিত ব্যক্তি, যিনি পবিত্র এ ভ্রমণপথের মাক্বাম, স্তর ও বিপৎসঙ্কুল স্থানসমূহের সূক্ষ্ম জ্ঞানার্জনে ব্যর্থ হয়েছেন।

উপরে [১ ও ২-এ] বর্ণিত এ দু’জনের পক্ষে কাউকে মুরীদ করে তরীকাতের দীক্ষাদান বৈধ নয়।

আধ্যাত্মিক জগতের রহস্য মানবের মধ্যে উন্মোচন ততক্ষণ পর্যন্ত হবে না যতক্ষণ না মুরীদ ও মুরাদের মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। মুরীদের ওপর মুরাদের

পূর্ণাঙ্গ নিয়ন্ত্রণ থকবে- আর এটা বিনা দ্বিধায় মুরীদকে মেনেও নিতে হবে। এ অবস্থাকেই বলে: "**মুরীদের দ্বিতীয় জন্ম**"।

যদিও আল্লাহর কুদরতে এটা সম্ভব যে, পিতা ছাড়াও পুত্রের জন্ম হওয়া- কিন্তু তাঁর হিকমাত এই যে, সাধারণত এরূপ হয় না। ঠিক অনুরূপ মুরীদ ও মুরাদের মধ্যে গভীর সম্পর্ক ছাড়া '**আধ্যাত্মিক জন্ম**' হয় না। কুদরতে এটা সম্ভব হলেও (যেমনটি সময় সময় হয়ে থাকে) কিন্তু হিকমাতে এরূপ হওয়া জটিল।

আরোও জানার ব্যাপার যে, 'পিতা ছাড়া জন্ম' এর মধ্যে বিপর্যয়ের সম্ভাবনা আছে, যেমনটি হয়েছিলো হযরত ঈসা আলাইহিস্সালামের ক্ষেত্রে। আল্লাহর কুদরতে পিতা ছাড়া জন্ম নেওয়ার পর শেষ পর্যন্ত খ্রিস্টানরা মারাত্মক ভুল করে বসলো- তাঁকে মনে করে নিলো 'আল্লাহর পুত্র' হিসেবে।

যদি কোনো আকর্ষিত ব্যক্তি (মজযূব) ঐশিজ্ঞানে পারদর্শী হয়ে ওঠেন, কোনো কামিল মুর্শিদের সুহবত ছাড়াই, তাহলে অন্যরা তাঁর দ্বারা বিপর্যয়ের সম্মুখীন হওয়া থেকে মুক্ত থাকবে না।

প্রেমিকের ক্ষেত্রে মুরীদ হচ্ছেন:

ভ্রমণকারী যিনি (আল্লাহর প্রতি) আকর্ষিত।

প্রেমাস্পদের ক্ষেত্রে মুরাদ হচ্ছেন:

যিনি (আল্লাহ কর্তৃক) আকর্ষিত ভ্রমণকারী।

কুরআনের আয়াত বুঝিয়ে দিয়েছে প্রেমিক ও প্রেমাস্পদের হাল কিরূপ হবে।

বান্দার অর্জন নয়- বরং ঐশি ইচ্ছাই হচ্ছে পছন্দের কারণ। হিদায়াতপ্রাপ্তির (গ্রহণযোগ্যতার) শর্ত বান্দাহ কর্তৃক তাওবাহ করার পূর্বেই নির্ধারিত। এ অবস্থায় পছন্দ হচ্ছে 'প্রেমাস্পদের হাল'। একমাত্র আয়োজন ও মাত্রায় প্রেমিকের হিদায়াতের হাল ও ভ্রমণের মাক্বামসমূহ নির্ধারিত হয়।

ভ্রমণকারী নিম্নের মাক্বামে পরিপূর্ণরূপে স্থিতিশীল না হয়ে উচ্চ মাক্বামে আরোহণ করতে পারবে না। সে আরোহণ করে:

প্রথম থেকে দ্বিতীয়টিতে; দ্বিতীয়টি থেকে তৃতীয়টিতে ইত্যাদি।

সুতরাং উক্তরূপ ক্রমানুসারে তারা (মুরীদরা) অতিক্রম করে সকল মাক্বাম। অবশেষে পৌঁছুয়ে যায় নিজেদের অস্তিত্ব বিলুপ্ত করে মুশাহাদার স্তরে- (প্রভুর) সামনা-সামনি।

এরূপ উন্নীত মাক্বামে উপনিতরাই মুর্শিদ কর্তৃক খিলাফত লাভের যোগ্যতা অর্জন করেন। তখন স্বীয় শায়খ কর্তৃক মুরীদও শায়খ হওয়ার মর্যাদায় ভূষিত হন। তিনি এবার নিজেই মুরীদ করার যোগ্যতা লাভ করেন।

মুর্শিদের মাক্বাম হচ্ছে মধ্যখানে:

(ক) গোপন ও প্রকাশের মাঝখানে।

(খ) প্রভু ও মানবের মাঝখানে।

এ মাক্বাম, দয়াময় প্রভুর সিংহাসনের মতো- গোলামের অস্তিত্ব। এর দু'টি দিক আছে। একপ্রান্ত আছে রহস্যময় গুপ্ত জগতের দিকে এবং অপরপ্রান্ত আছে বাহ্যিক বস্তুজগতের দিকে। প্রথমটি দ্বারা গোলাম তার প্রভুর দয়া তাঁর গুপ্ত জগত থেকে প্রাপ্ত হয়। দ্বিতীয়টি দ্বারা সে তার প্রাপ্ত ধন প্রচার করে ও ছড়িয়ে দেয় বস্তু জগতে ও মানবসমাজে।

হালের শুরুতে যখন প্রেমিকরা আধ্যাত্মিক ভ্রমণে যায় আকর্ষণের সাহায্যে, তখন তারা মাক্বামের প্রান্তর অতিক্রম করতে থাকে- একটি মাত্র আকর্ষণ নিয়ে। ঐসময় প্রেমিকরা আমলের হাক্বিকাত সম্পর্কে সম্যক অবগত হতে সক্ষম হয়। তাদের হালের পবিত্রতায় সম্পৃক্ত থাকে মাক্বাম পবিত্রকরণের উপকরণ।

মাক্বামসমূহে সম্পৃক্ততা মূলত সাধারণ প্রেমিকদের জন্য খাস। তারা তখনো পৌঁছুয় নি কাশফ এর জগতে। তাদের আধ্যাত্মিক ভ্রমণস্থান তখনো নফসের অন্ধকার দূরীকরণের স্তরে। প্রতিটি মাক্বাম তাদের জন্য নফসের একেকটি অন্ধকার গুণের শুদ্ধিকরণের স্তর। অবশেষে নফস ঐশি আলোক দ্বারা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে- লাভ করে ঔজ্জ্বল্যতার চমৎকারিত্ব।

নফসের মতো, প্রকৃতির প্রতি আকর্ষণ হচ্ছে একটি অন্ধকার (যা, আন্তরিক সবরের মাক্বাম মুছে ফেলে); দুনিয়াবী ফূর্তি-আমোদে মত্ত হওয়া একটি অন্ধকার (যা, তপশ্চর্যার মাক্বাম দ্বারা বিদূরিত হয়); আল্লাহর ওপর নিশ্চিত ভরসার ক্ষেত্রে কমতি একটি অন্ধকার (যা, রিজার মাক্বাম দ্বারা মুছে দেওয়া যায়)। অতএব, প্রত্যেক মাক্বামেই একটি করে অন্ধকার মুছে ফেলা হয়- যতক্ষণ না নফসের মধ্যে আর কোনো অন্ধকার অবশিষ্ট না থাকে। অবশেষে এসব অন্ধকার পর্দা-উন্মোচন পরিপূর্ণ হয়ে গেলে ইয়াকীনের সৌন্দর্যমণ্ডিত মুখখানা দৃষ্টির মাঝে ভেসে আসে।

সর্বোচ্চ কামিল মুরাদ (অনুসরণীয়, প্রেমাস্পদ, মুর্শিদ) এবং সর্বোচ্চ মাহবুব (প্রেমাস্পদ) হচ্ছেন সায়্যিদিল মুরসালীন, পেয়ারে নবীজী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

একমাত্র তিনি ছাড়া আর কাউকে পরানো হয় নি সর্বোচ্চ সম্মানের পোশাক "প্রেমাস্পদ"। উম্মতের জন্য নবীপ্রেমের নিদর্শন হচ্ছে নজীবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লামের পবিত্র সুন্নাতের অনুসরণ। এমনকি তাবিঈনের নিকট তাঁর অনুসরণ ছিলো সকল প্রেমের মাক্বাম থেকেও সর্বাধিক প্রিয়।

হযরত আবু আলী দাক্কাক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন:

মূসা (আ.) যখন একজন মুরীদ (প্রেমিক) হলেন তখন বললেন: “হে প্রভু! আমার হৃদয়কে খুলে দিন”।

মুহাম্মদ (সা.) যখন একজন মুরাদ (প্রেমাস্পদ) হলেন তখন আল্লাহ তাঁকে বললেন: “আমি কী তোমার হৃদয়কে খুলে দিই নি?”।

মূসা আলাইহিস্সালাম বললেন: “আপনাকে দেখতে চাই!” প্রভুর পক্ষ থেকে জবাব আসলো: “কখনো আমাকে দেখতে পারবে না!”

হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ তা’আলা বললেন: “আপনি কী, আপনার প্রভুর দিকে তাকাবেন না? (হ্যাঁ, অবশ্যই তাকাবেন)”।

আকর্ষণের হাক্বিকাত সম্পর্কে দৃষ্টান্ত হলো: মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি তাঁর প্রেমাস্পদের (প্রভুর) আকর্ষণ যেনো চুম্বকের প্রতি লোহার আকর্ষণ।

মহাপ্রভুর প্রেমের চুম্বক থেকে রূহে মুহাম্মাদ (সা.) প্রাপ্ত হয়েছে তাঁর উম্মতের প্রতি মুহাব্বতের আকর্ষণ। হাজার হাজার সাহাবায়ে কিরামের রূহসমূহকে তিনি মুহাব্বতের চুম্বক দ্বারা নিজের দিকে আকর্ষিত করে ইসলামের সুশীতল ছায়ায় একত্রিত করেন। যার যার সামর্থ অনুযায়ী সৌভাগ্যের চরম শিখরে উন্নীত সাহাবায়ে কিরাম রিদ্বওয়ানিল্লাহি তা’আলা আজমাঈন এই আকর্ষণের অংশীদার হোন। এরপর তাঁদের সুহবত লাভে সৌভাগ্যশীল তাবিঈনের রূহ চুম্বকার্ষণ লাভ করে।

এভাবে যুগ থেকে যুগান্তরে, জরায়ু থেকে জরায়ুতে, তাবিঈনের রূহ থেকে মাশাইখে আজম ও হক্কানী উলামায়ে কিরামের রূহে চুম্বকার্ষণ প্রতিস্থাপন হয়ে আসছে। মুরাদ (মুর্শিদ) থেকে মুরীদের মাঝে আকর্ষণের শিকল বাঁধা হয়; এবং মুরাদে যাঁরা পরিণত হন, সকলেই মুরীদ থেকেই রূপান্তরিত।

এটাই হচ্ছে হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অনুসরণের উত্তম ফলাফল। এ সৌভাগ্য একমাত্র উম্মতে মুহাম্মদী তথা মুসলমানদের জন্য খাস ও নির্ধারিত।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পূর্ণাঙ্গ সুন্নাতের অনুসরণ ও মুর্শিদের রূহের সঙ্গে শিকল বাঁধার মাধ্যমে যে কেউ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রূহ মুবারকের সঙ্গে একাত্ম হয়েছে, তার মধ্যে প্রকাশ পাবে আল্লাহপ্রেমের ছোঁয়া। অবশেষে এ ব্যক্তি আল্লাহ চাহেন তো, আল্লাহর উচ্চপর্যায়ের প্রেমাস্পদে পরিণত হয়ে নিজেই মুর্শিদ হওয়ার যোগ্যতা লাভ করতে পারেন।

চল্লিশতম পরিচ্ছেদ

ই'তিকাদ [বিশ্বাস]

আরবি শব্দ '**ই'তিকাদ**' ও '**ইত্তিহাদ**' এর অর্থ হচ্ছে:

অস্তিত্বের রহস্যজগতে এক ধরনের জ্ঞান (ইলম) হৃদয় মাঝে এসে স্থিতিশীল হওয়া।

হালের শুরুতে বার বার জ্ঞানের আলো অন্তরকে আলোকিত করে তুলে- এটাই হচ্ছে ই'তিকাদের শুরু। ই'তিকাদের অবস্থা অব্যাহত থাকার ফলে ক্রমান্বয়ে নফস একটি শিশুর নফসের মতো নিষ্কলুষ হয়ে ওঠে।

ইত্তিহাদ অবস্থায় ঈমানের স্থিতিশীলতা (অক্ষয়) লৌহশক্ত ভাস্কর্যের মতো হয়ে ওঠে। এটা এতোই ইস্পাত-কঠিন যে, এর মধ্যে অন্য কোনো আকারের আত্মপ্রকাশ সম্পূর্ণ অসম্ভব।

ই'তিকাদের অবস্থায় বান্দার মধ্যে ঈমানের হাক্বিকাত তার অতীত (বাতিল) কৃষ্টি, দুশ্চরিত্র ইত্যাদিকে মুছে ফেলে; তাকে নিয়ে যায় প্রথম সৃষ্টির পবিত্রতায়; অন্তর থেকে ছিড়ে ফেলে সব ধরনের জেদ বা একগুঁয়েমি ও উচ্চাকাঙ্ক্ষা। এভাবে সালিক হয়ে ওঠে সত্যিকার ঈমানদার। তার নিকট আল্লাহর পবিত্র সত্তা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে, ওহির প্রভাবে এবং নবুওয়াতের নূরে সাহাবায়ে কিরামের নফস জাহিলিয়্যাতের অন্ধকার থেকে মুক্ত হয়ে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। তাঁদের অন্তর স্বভাবের কলুষতা ও অবৈধ দুনিয়াবী আকাঙ্ক্ষা থেকে দূরে সরে গিয়েছিল। তাঁরা আখিরাতের উত্তম প্রাপ্তির আশায় দুনিয়াকে বিসর্জন

দিয়েছিলেন। ঈমানের আলোকে সবাই আল্লাহর নৈকট্য লাভের নেশায় নিজেদের জীবনকে উৎসর্গ করে দেন। আল্লাহর গোপন রহস্যাবলীর সম্মুখস্থ যাবতীয় পর্দা তাঁদের সকাশে উন্মোচন হয়ে ওঠে। অতএব, তাঁদের ঈমান ছিলো কোনো প্রকার সন্দেহের উর্ধ্বে। সাহাবায়ে কিরামের জামাআতে ঈমানের ক্ষেত্রে কোনো ধরনের মতানৈক্য সৃষ্টি হয় নি। এ ব্যাপারে তাঁদের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ ইজমা ছিলো।

যখন নবুওয়াতের সূর্য পর্দাবৃত হলো; এবং পবিত্রতার আলো বিশালতার পর্দার মধ্যে আবদ্ধ হয়ে গেলো, তখন মানুষের নফসের জমিনকে দুনিয়াবী আকাঙ্ক্ষার অন্ধকার ছেয়ে নিলো এবং মুছে গেলো সেখান থেকে ঐশি নূরের পবিত্র চমক।

সূর্যের চতুর্দিকে পর্দা পড়ে যাওয়ায় সে লুকিয়ে গেলো। সে এখন শুধুমাত্র তার ছায়া নির্গত করলো; এবং ক্রমে ক্রমে এতে লুকিয়ে থাকা দুনিয়াবী আকাঙ্ক্ষার অন্ধকার অতর্কিতে হামলা করে বসলো!

হৃদয়সমূহ আনুগত্যের ময়দান থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলো। এগুলো তখন শয়তানের ওয়াসওয়াসার ক্ষেত্রে পরিণত হয়ে গেলো।

নবুওয়াতের দূরত্ব যতোই বাড়তে থাকে পর্দাবৃত হওয়ার মাত্রাও ততো বেশি বৃদ্ধি পেতে থাকে। মানুষের মধ্যে প্রতিনিয়ত সামঞ্জস্যহীনতা ও ফিতনা-ফাসাদ গজে ওঠতে শুরু হয়।

সুতরাং, যে কেউ মহাসত্যের সন্ধানী তাকে অবশ্যই প্রথম যুগের মহাত্মনদের অনুসরণ করতে হবে। এরা হচ্ছেন সাহাবায়ে কিরামের জামাআ'ত- আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত। তাকে দুনিয়ার লিপ্সা ও ভালোবাসা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে হবে। এতে তার মধ্যে হাক্কুল ইয়াকিনের নূর দ্বারা উন্মোচন হয়ে যাবে ফিরাসাতের দূরদর্শন। তার মধ্যে হয়তো হাক্বিক্বাতের মহাসত্য একদা আত্মপ্রকাশ করবে।

হাক্বিক্বাত উন্মোচন হবে শুধুমাত্র:

সত্যিকার পবিত্রতা দ্বারা।

দাতার দরবারে পূর্ণাঙ্গ আশ্রয় দ্বারা।

নফসের পর্দার অবিরত অভিযোগ দ্বারা।

আল্লাহর দয়া হেতু নিজেকে সর্বদা পাপমুক্ত রাখার মাধ্যমে।

যাকিছু প্রশ্নে থাকে আন্তরিকতা, আল্লাহ তা'আলা এগুলোর জবাব কলবে ঢেলে দেন। যাকে আল্লাহ দুনিয়ার খাহিশাত থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার তাওফিক দিয়েছেন এবং খোদাপ্রেমের মিষ্টি সুরার পরমানন্দ দ্বারা হৃদয়কে সিক্ত করেছেন- মুছে ফেলেছেন সকল দুনিয়াবী প্রেম-ভালোবাসা; যার মধ্য থেকে ধ্বংস হয়ে গেছে কলহের যাবতীয় শিরা-উপশিরা; এবং যে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টি দ্বারা মানবতার দিকে দৃষ্টিপাত করেছে, সে তো ঘৃণ্যতার অভিশাপ থেকে মুক্তি লাভ করলো- সে-ই তো যোগ্যতা লাভ করলো ''**ফিরক্বা-ই-নাযিয়া**''র উপাধিতে ভূষিত হওয়ার।

একচল্লিশতম পরিচ্ছেদ

ইলমে ফারিদ্বা [আল্লাহর হুকুমের জ্ঞান]

সকল মুসমানের জন্য অবশ্য-অর্জনীয় ইলমে ফারিদ্বা'র ব্যাখ্যা সম্পর্কে উলামায়ে কিরামের মধ্যে মতানৈক্য বিদ্যমান:

কেউ কেউ বলেছেন এটা হলো:

(ক) 'ইলমে ইখলাস' (আন্তরিকতার জ্ঞান):

এর কারণ হলো, আল্লাহর আনুগত্য হওয়া যেমন তাঁর নির্দেশ, তেমনি এ আনুগত্যতায় আন্তরিক হওয়াও আল্লাহর নির্দেশ। জ্ঞানের দাবি হলো আমলের জরুরত। সুতরাং ইলমে ইখলাসের জন্য আমল জরুরি।

(খ) ইলমে আফাত-ই-ইখলাস (আন্তরিকতার বিপর্যয়ের জ্ঞান):

এটাকে বলা যায় নফসের গুণাবলী, যেখানে ইখলাসের শক্তিই হচ্ছে এ গুণাবলী। ইলমে ইখলাস তখন নির্ভর করবে নফসের গুণাবলীর ইলমের ওপর।

(গ) ইলমে ওয়াকত্ (সময়ের জ্ঞান):

দৈনন্দিন আমলের ক্ষেত্রে কোন্ সময় কোন্টির জন্য উত্তম তা জানার জ্ঞানকে ইলমে ওয়াক্ত বলে।

(ঘ) ইলমে হাল (আধ্যাত্মিক অবস্থা):

এ জ্ঞানের অর্থ হলো প্রভু ও বান্দার মধ্যে আধ্যাত্মিক সম্পর্কের অবস্থা সম্পর্কে অবগত হওয়া। খাস করে এ হালের মধ্যে কী কী

আইন-কানুন জড়িত তা-ও জানা। এ জ্ঞানের অতিরিক্ত অংশ ও এর ক্ষতিকর বিষয় সম্পর্কে জানাও এর অন্তর্ভুক্ত।

(ঙ) ইলমে খাওয়াতির (চিন্তাজ্ঞান):

এ জ্ঞানের সঙ্গে সম্পর্কিত আছে আমল ও চিন্তার সূত্র এবং আমলের সুপরিণতি ও কুফল কী- সে ব্যাপারে পার্থক্যনির্ণয়।

উপরে বর্ণিত সবই মূলত '**ফজিলত**' (উত্তমতা) - '**ফারিদ্বা**' (প্রভুনির্দেশ) নয়। প্রভুনির্দেশ বা ফারিদ্বা কখনও অমান্য করা যাবে না।

'**ইলমে ফারিদ্বা**' যদি ঐগুলোর মধ্যকার কোনো জ্ঞান হয়ে থাকে যা মুসলমানদের জন্য আইনসঙ্গত নয়, তাহলেই তা পরিত্যাজ্য হতে পারে।

হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাকিছু বলেছেন তা সকল মুসলমানদের সাথে সম্পর্কিত। তবে এ সম্পর্কে সবকিছু জানা সকল মুসলমানের জন্য সম্ভব নয়। এই জ্ঞানার্জনের জন্য সবাইকে উপযুক্ত বানানোও অসম্ভব। যা কারোর জন্য সহনীয় নয় তার পেছনে লেগে থাকাও বৈধ নয়।

এ ব্যাপারে প্রাথমিক যুগের মহাত্মনদের কউল (বাণী) কতোই না সত্যি!

শায়খ আবু তালিব মক্কী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির কউল:

ইসলামের জ্ঞানের মূল সূত্র হচ্ছে পাঁচটি স্তম্ভ সম্পর্কে জানা-

১. কালিমায়ে শাহাদাতাইন- দু'টি পবিত্র সাক্ষ্যবাক্য।

২. সালাত - দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামায।

৩. যাকাত - সম্পদশালীদের কর্তৃক নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থদান।

৪. সওমে রামাদ্বান - রমজান মাসের রোযা।

৫. বাইতুল্লাহ্র হাজ্জ - সামর্থবানদেরকে মক্কা মুকাররমায় যেয়ে সঠিক সময়ে হাজ্জব্রত পালন।

আরো জানার ব্যাপার হলো: ইলমে বাঈ (ক্রয়-বিক্রয়); ইলমে শারা' (বিক্রয় জ্ঞান); ইলমে তালাক (বিবাহচ্ছেদ জ্ঞান); ইলমে নিকাহ্ (বিবাহজ্ঞান)।

মর্যাদার স্তর উঁচু-নিচু হওয়ার সাথে এসব জ্ঞানার্জন ও সঠিক আমল সম্পর্কিত আছে। আর এগুলো সম্পর্কে সম্যক অবগতি অর্জন করা সকল বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের জন্যই সম্ভব।

সকল কউলের সারমর্ম হযরত উমর সুহরাওয়ার্দি রাহিমাহুল্লাহর কউলে বিদ্যমান:

"এটা হচ্ছে '**ইলমে মুতাফারদ্ব**' (নির্দেশিত জ্ঞান) বা আল্লাহর আদেশ ও নিষেধ সম্পর্কিত জ্ঞান।"

কারণ, বান্দাকে ভালো আমল করা ও মন্দ আমল থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সুতরাং সঠিকভাবে এ নির্দেশ পালনে তাকে এ দু'টো সম্পর্কে অবশ্যই জ্ঞান রাখা একান্ত জরুরি।

আদেশ ও নিষেধ সম্পর্কিত শরঈ আইন-কানুন মূলত দু'ধরনের:

(ক) সাধারণ ব্যক্তিদের জন্য উপলব্ধিযোগ্য বিষয়াদি:
যেমন: ইলমে মুবানি-ই-ইসলাম: যেমন: ইলমে নিকাহ, ইলমে বাঈ, ইলমে শারা' ও ইলমে তালাক।

এগুলো সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞান থাকা সকল মুসলমানের জন্য অবশ্যকর্তব্য। এর কারণ তিনটি: প্রয়োজনীয়তা, আবশ্যকতা ও চাহিদা।

(খ) খাস ব্যক্তিদের জন্য উপলব্ধিযোগ্য জ্ঞান:
যেমন: উলূমে ফাজাইল (উত্তমতার জ্ঞান), ইলমে ইখলাস (আন্তরিকতার জ্ঞান), ইলমে খাওয়াতির (চিন্তাজ্ঞান), ইলমে হাল

(আধ্যাত্মিক অবস্থার জ্ঞান) ও অন্যান্য জ্ঞান যেগুলোর ওপর ইতোমধ্যে আলেচনা হয়েছে।

উপরোক্ত (খ-এ উল্লিখিত) জ্ঞানসমূহ সাধারণ্যের জন্য নয়- বরং এগুলো কিছু খাস মানুষের ক্ষেত্রে উপযোগী যাদেরকে দান করা হয়েছে বিশেষ উপলব্ধি ক্ষমতা।

কোনো কোনো আসহাবে কিরাম রাদ্বিআল্লাহু আনহুম আক্ষেপ করে বলেছেন: "অপবিত্র চিন্তাকে আমলে পরিণত করা থেকে বিরত থাকার ক্ষমতা আমাদের আছে; তবে অপবিত্র চিন্তা জাগ্রত হওয়া থেকে নিজেদেরকে পবিত্র রাখার ক্ষমতা আমাদের নেই। যদি এসব (অপবিত্র চিন্তা) সম্পর্কে হিসাব নেওয়া হয় ও তা শাস্তিযোগ্য হয়- তাহলে তো আমাদের উপায় নেই!"

এ সম্পকে কুরআন শরীফের এই আয়াত নাযিল হলো:

-"যারা সীমালঙ্ঘন করে না, আল্লাহ তাদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত করবেন না।"

যে কেউ নির্দেশ পালনে অপারগ হয়, তার ওপর নির্দেশ পালন পালনীয় নয়; এবং তা পালন না করায় সে ক্ষতিগ্রস্ত হবে না।

যে কেউ অপবিত্র চিন্তাকে দূরে রাখতে সক্ষম- তার ওপর কিন্তু সকল নির্দেশ পালনীয় হবে।

শায়খদের মধ্যে যিনি কোনো ব্যাপারে ইয়াকিন রাখেন ও বুঝতে সক্ষম হন যে এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্দেশ, তাহলে তিনি তাঁর নিজের অবস্থাভেদে উক্তি করেছেন। [এটা শরঈ নির্দেশ নয়] এই সীমাবদ্ধতা ব্যক্তির উপলব্ধিযোগ্যতার ওপর নির্ভরশীল। অন্যান্যরা যেসব জ্ঞান সম্পর্কে বলেছেন এবং নিজেদের হালের কারণে প্রভুর পক্ষ থেকে নির্দেশ হিসেবে মনে করেছেন, তাঁরা এগুলোকে আখ্যায়িত করেছেন: "ইলমে দিরাসাত" [পাঠদান জ্ঞান] ও "ইলমে ওয়ারিসাত" (উত্তরাধিকার জ্ঞান) হিসেবে।

বিয়াল্লিশতম পরিচ্ছেদ

মানুষের 'হাল' [আধ্যাত্মিক অবস্থা]

মাত্রার পরিমাণ মুতাবিক মানবকুলের স্তর মূলত তিনটি:

১. ওয়াসিল (আল্লাহ্ওয়ালা) ও কামিল (উৎকৃষ্ট) ব্যক্তিরা।
ওয়াসিল তাঁরা, যাঁরা মুকাররাব (প্রভুর নৈকট্যশীল) ও সাবিক।

২. সালিক (তরিকতের রাস্তায় ভ্রমণকারী)।
এরা হচ্ছেন পরহেজগার; আসহাবে ইয়ামিন (ডানদিকের দল)।

৩. মুক্বিম (অবস্থানকারী)- আসহাবে শিমাল (বামদিকের দল)।

উসূল (আল্লাহর সঙ্গে মিলিত) ব্যক্তিদের মধ্যে তিনটি দল আছে:

১. আম্বিয়ায়ে আলাইহিমুস্সালাম (নির্বাচিত দল): এরা হচ্ছেন নবী ও রাসূল। আল্লাহ এদেরকে পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন মানুষকে হিদায়াতের দিকে আহ্বান জানাতে। তাঁরা হচ্ছেন গোপন রহস্যজগৎ ও সৃষ্টজগতের মধ্যমণি। তাঁরা মানুষকে আল্লাহর দিকে নিমন্ত্রণ জানান।

২. মুতাসাওয়িয়্যিফা (বিশিষ্ট দল): এরা হচ্ছে মাশাইখে কিরাম। তাঁরা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পূর্ণাঙ্গ ইত্তিবার মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্যশীল বান্দায় পরিণত হয়েছেন। এরপর তাঁরা মানুষকে মুহাম্মদী তরীকার দিকে আহ্বান জানান। এরাই হচ্ছেন তরিকতের মাশাইখে আজম।

৩. জামা'আত (বিশেষ দল): এরা হচ্ছেন উলামায়ে কিরাম। নিজেদেরকে দ্বীন সম্পর্কে জ্ঞানবান ও অভিজ্ঞ করার পর তাঁরা সাধারণ মানুষকে ইসলামের প্রতি

দাওয়াত প্রদান করেন। ওয়ারাসাতুল আম্বিয়া হিসেবে তাঁদের দায়িত্ব হলো পবিত্র শরীয়াতকে সংরক্ষণ করা।

সালিক দু'প্রকার: ১. উচ্চতর লক্ষ্যর্জনের সন্ধানী; এবং আল্লাহপ্রাপ্তির মুরীদ। ২. বেহেশত লাভের সন্ধানী; এবং পরজগতের মুরীদ।

আল্লাহপ্রাপ্তির মুরীদরা হচ্ছেন:

(ক) মুতাসাওয়িফাহ: এরা হচ্ছেন ঐ দল যারা নফসের কিছু কিছু গুণাবলী থেকে মুক্ত হতে পেরেছেন এবং সুফিদের কোনো কোনো হাল ও গুণাবলী অর্জন করতে সক্ষম হয়েছেন। তবে নফসের কিছু কিছু ক্ষতিকর গুণাবলী অবশিষ্ট থাকায় তারা আল্লাহর নৈকট্য লাভ ও সুফিয়্যার চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছুতে পারেন নি।

(খ) মালামাতিয়্যাহ: এরা হচ্ছেন ঐ দল, যারা ইখলাসের হাক্বিক্বাত অবলোকনের মধ্যে এবং সিদক্বের আইন-কানুন সংরক্ষণের মাঝে অনেক সাধনা করেছেন। এরা নিজেদেরকে লুকিয়ে রাখেন। ইবাদতের ক্ষেত্রে একবিন্দুও পিছপা হন না। একটি নফলও তরক করেন না। তাদের মধ্যে সর্বাবস্থায় ইখলাসের হাল বিদ্যমান। তাদের অবস্থা (হাল) ও কর্মে (আমলে) আল্লাহর সন্তুষ্টি বৈ আর কিছু নেই।

মুতাসাওয়িফাহ ও মালামাতিয়্যাদের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য হচ্ছে:

(ক) মুতাসাওয়িফাহ বা সুফিয়্যাহরা হচ্ছেন 'মুখলাস'- উদ্ধারকৃত।

(খ) মালামাতিয়্যাহরা হচ্ছেন 'মুখলিস' - আন্তরিক।

উভয় দলের 'হালে'র ব্যাখ্য হচ্ছে এই:

"তারা, আন্তরিকতায় এবং আমরা (আল্লাহ কর্তৃক) উদ্ধারকৃত"।

পরজগতের আকাঙ্ক্ষীদের চারটি দল আছে:

১. জুহহাদ (এক বচনে জাহিদ)- শুষ্ক কঠোর সাধকগণ।
২. ফুক্বারা (এক বচনে ফকীর) - নিঃস্বরা।
৩. খুদ্দাম (এক বচনে খাদিম) - আল্লাহর গোলামগণ।
৪. 'উব্বাদ (এক বচনে 'আবিদ) - আল্লাহর রাস্তায় উৎসর্গিতরা।

১. জুহহাদ: এরা হচ্ছেন তাঁরা যারা ঈমান ও হাক্বিকাতের নূরে নূরান্বিত। তাঁরা আখিরাতের সৌন্দর্যদর্শন করেন। ইহজগতের মধ্যে তারা দেখতে পান কদর্যতা স্পষ্টভাবে। তাদের ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষা দুনিয়াবী 'ফানি' [ধ্বংসশীল] মূল্যহীন চাকচিক্য থেকে মুক্ত। তারা আকর্ষিত থাকেন 'বাকি'র (চিরস্থায়ীত্বের) সৌন্দর্যের প্রতি।

'সুফিয়্যা' ও 'জাহিদদের' মধ্যে পার্থক্য বিদ্যমান। জাহিদরা নিজের নফসের জয় হেতু আল্লাহ থেকে পর্দাবৃত। আর নফসের জয়ের ক্ষেত্র হচ্ছে জান্নাত। অপরদিকে সুফিয়্যা দর্শন করেন শুরুহীন চিরন্তনের সৌন্দর্য। তাঁরা সর্বদা চিরন্তনের 'জাত'র প্রেমে মত্ত। সুতরাং তাঁরা উভয় জগতের পর্দাবৃততা থেকে মুক্ত।

ইহজগতের বেলা জাহিদ হয়তো সকল জয়কে বিসর্জন দিয়েছেন। কিন্তু পরজগতের ক্ষেত্রে তিনি বরণ করেছেন অফুরন্ত নিয়ামত। হাদিসে আছে:

> "*যারা পরজগতের শান্তির আকাঙ্ক্ষী তাদের জন্য ইহজগতের আনন্দ অবৈধ। যারা ইহজগতের আনন্দ-বিলাসে মত্ত তাদের জন্য পরজগতের চিরশান্তি অবৈধ। আর আল্লাহপ্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষীদের জন্য উভয় জগতের ভোগ-বিলাস অবৈধ।*"

তাপশ্চর্যার (জুহদের) মর্যাদা থেকে সুফিয়্যার মর্যাদা উপরে। কারণ জাহিদ ইহজগতকে বিসর্জন দিয়েছেন পরজগতে বেহেশত লাভের আশায়। অপরদিকে

সুফি উভয় জগতের ভোগ-বিলাসকে বিসর্জন দিয়েছেন চিরন্তন প্রভুকে পাওয়ার আশায়।

২. ফুক্বারা: তাঁরা হচ্ছেন ইহজগতের অস্থাবর সম্পদ গ্রহণ থেকে মুক্ত। তাঁরা শ্রেষ্ঠত্ব ও ঐশি রিজওয়ান লাভের আশায় নিজেদের আবাসভূতি থেকে পৃথক হয়ে গেছেন এবং বিসর্জন দিয়েছেন আভ্যাসিক বস্তুসমূহ।

ফক্বিরীর পন্থাবলম্বনের কারণ নিচের তিনটির একটি:

১. রোজ কিয়ামতের কঠিন, চুলচেরা হিসাব-নিকাশকে পাতলা ও সহজ রাখার আশা। কারণ, প্রয়োজনাতিরিক্ত সম্পদের হিসাব সেদিন সঠিকভাবে দিতে না পারলে শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে।

২. উত্তম প্রতিদান লাভ ও বেহেশতে প্রবেশের আশা। ফুক্বারাদের জন্য হযরত জিব্রাঈল আলাইহিস্সালাম একদিন সুসংবাদ নিয়ে আসলেন পেয়ারে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট:

> “*আপনার উম্মতের মধ্যে যারা গরীব তারা ধনীদের ৫০০ বছর পূর্বে বেহেশতে প্রবেশ করবে*”

৩. আইনসঙ্গত অল্প সম্পদ হেতু অন্তরে প্রশান্তি লাভের আশা। এতে সৃষ্টি হয় ঈমান-আমলের প্রতি বেশি আকর্ষণ। আরো লাভ হয় ইবাদতের মধ্যে খুজুখুশু।

মালামাতিয়্যাহ ও মুতাসাওয়্যিফাহ এবং ফুক্বারার মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে, শেষোক্তদের উদ্দেশ্য মূলত বেহেশত লাভ। এর সাথে সম্পর্ক আছে নফসের আকাঙ্ক্ষা। অপরদিকে প্রথমোক্ত উভয় দলের আকাঙ্ক্ষা হচ্ছে আল্লাহপ্রাপ্তি ও তাঁর নৈকট্য লাভ করা।

তবে সুফির মাক্বামও কিন্তু উচ্চতর ফক্বরের আরেক মাক্বাম। সুফিও দুনিয়াবী ভোগ-বিলাস বস্তু বিসর্জন দিয়েছেন। তিনি আমল, হাল ও মাক্বাম পর্যন্ত বিসর্জন দিয়েছেন- কারণ, এগুলো তাঁর নিজের বলে তার মধ্যে ধারণাও নেই। তার নিকট এসব বস্তুও মূল্যহীন- তিনি স্বয়ং নিজেকেও মূল্যহীন হিসাবে দেখেন। সুফির ফক্বর শুধু দৃশ্যমান ভোগ-বিলাসের বস্তু, ধন-সম্পদ ইত্যাদির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়- বরং তার সত্তাও মূলত মূল্যহীন ও নিঃস্ব- এ উচ্চতর হালের মধ্যে সুফির মানসিক অবস্থান।

তিনি তখন যা, তাহলো:

উজূদহীন (অনস্তিত্বশীল)।
জাতহীন (নির্যাসমুক্ত)।
সিফাতহীন (গুণহীন)।

তিনি মাহব এর মধ্যে মাহব (নিশ্চিহ্নের মধ্যে নিশ্চিহ্ন); ফানার মধ্যে ফানা (বিলুপ্তের মধ্যে বিলুপ্ত)।

সুফি মাশাইখে আজম সঠিক 'ফক্বর' সম্পর্কে উপরোল্লিখিতভাবে ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

অন্যরা বলেছেন, যার মধ্যে ধারণা ও গুণাবলী অনুপস্থিত তিনি সুফি; আর যার মধ্যে বস্তুগত পদার্থ অনুপস্থিত তিনি হচ্ছেন ফকির।

হযরত আবুল আব্বাস নাহাওয়ান্দী রাহিমাহুল্লাহ বলেন: "ফক্বরের শেষ থেকে তাসাওউফের শুরু।"

কোনো কোনো মাশাইখে কিরাম বলেন: “ফকির ধন-সম্পদ লাভের ব্যাপারে এরূপ সতর্ক থাকবে যেরূপ ধনী ব্যক্তি গরীব হওয়ার ব্যাপারে সতর্ক থাকে। ধনপ্রাপ্তির কারণে ফকির তার ফক্বরের মাক্বাম থেকে বঞ্চিত হবে। অপরদিকে ধন হারানোর কারণে ধনী ব্যক্তি ধনাঢ্য হওয়ার অবস্থা থেকে বঞ্চিত হবে।”

একদা এক ধনী ব্যক্তি দশ হাজার দিরহাম নিয়ে হযরত ইব্রাহিম ইবনে আদহাম রাহিমাহুল্লাহর দরবারে হাজির হলো। অনুরোধ জানালো, হযরত! এই দিরহামগুলো হাদিয়া হিসেবে গ্রহণ করুন।

ইব্রাহিম ইবনে আদহাম রাহিমাহুল্লাহ দিরহাম গ্রহণ করতে অস্বীকার করলেন এবং বললেন, “আপনি কী দশ হাজার দিরহামের বিনিময়ে ফুক্বারার তালিকা থেকে আমার নামটি মুছে ফেলতে চচ্ছেন?”

‘ফক্বর’ ও ‘জুহদ’র মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে:

জুহদ ছাড়াও ফক্বর অর্জন সম্ভব। সুতরাং, কেউ চাইলে ইয়াকিনের আকাঙ্ক্ষাসহ দৃঢ়ভাবে জাগতিক ভোগ-বিলাসকে বিজর্সন দিতে সক্ষম। তবে তার মধ্যে অবশ্যই হৃদয়াকাঙ্ক্ষা অবশিষ্ট থাকবে। অপরদিকে ফক্বর ছাড়াও জুহদ অর্জন সম্ভব। সুতরাং, কেউ চাইলে অস্থায়ী জাগতিক সম্পদের মালিক হয়েও এগুলোর আকর্ষণ ও জয় থেকে নিজেকে মুক্ত রাখতে সক্ষম।

ফক্বরের একটি রীতি আছে- গরীবী অর্জনের ইচ্ছা। এর হাক্বিক্বাত হচ্ছে গুণাবলীকে নিময়তান্ত্রিকতা থেকে মুক্ত করা। নিজেকে বস্তু পছন্দের ঊর্ধ্বে রাখা।

ফক্বর হচ্ছে জুহদের অবস্থা ও এর প্রতীক। জুহদের অর্থ হচ্ছে দুনিয়া থেকে দূরে যাওয়া ও আল্লাহপ্রাপ্তির মধ্যে নিজেকে আত্মনিয়োগ করা।

যখন সুউচ্চ ইমারতের আড়ম্বরের নিচে, আল্লাহ ইচ্ছে করেন অচেনাদের পলক থেকে পর্দাবৃত হতে; তাঁর কিছু ওলিকে তিনি বাহ্যিকভাবে ধনাঢ্যদের বস্ত্রে আবৃত করেন (যা হলো এক প্রকার আকাঙ্ক্ষা)। এতে তাদেরকে বাহ্যিক ব্যক্তিরা মনে করে, দুনিয়াদার। এতেকরে, লুকিয়ে যায় সুযোগ-বঞ্চিতদের দৃষ্টির আড়ালে ওলিদের অভ্যন্তরীণ উচ্চ হাল ও মাক্বাম।

জুহদ ও ফক্বরের হাক্বিকাতের মর্মস্থল হলো সুফিদের হালের বিশেষ ব্যাখ্যা ও আবশ্যকতা। ফক্বরের রীতির অন্তর্ভুক্ত হলো কিছু সুফি শায়খের পছন্দ; এবং এর মধ্যে তাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে রাসূলের ইত্তিবা, দুনিয়ার খাহিশাত থেকে মুক্ত হওয়া, সালিকদেরকে ফক্বর ও হালের জিহ্বা দ্বারা উদ্দীপ্ত ও আমন্ত্রণ করা। এদিক থেকে তাদের এ পছন্দ আল্লাহর পছন্দের অনুকূলে- কারণ এতে দুনিয়াবী কোনো ফায়দা হাসিলের উদ্দেশ্য নিহিত নয়।

৩. খুদ্দাম: এরা পছন্দ করেছেন ফুক্বারা ও প্রভুপ্রাপ্তির রাস্তার সালিকদের খিদমাত করতে। এরা প্রভুর নির্শেনাবলী নিয়মিত পালন করেন। এরপর নিজেদেরকে দুনিয়াবী কাজকর্ম থেকে মুক্ত রাখেন ও অন্তরকে জীবন ধারণের চিন্তা থেকে মুক্ত রেখে একমাত্র আখিরাতের উদ্দেশ্যে নিবেদিত করেন। তারা এই নাওয়াফিল (ঐচ্ছিক) খিদমাতকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। এরা শরীয়তসম্মত আয় তথা সাদক্বা, লিল্লাহ, হাদিয়া ইত্যাদি গ্রহণ করেন। তাদের দ্বারা অর্থ গ্রহণ ও দান উভয়টিই একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির অনুকূলে থাকে। টাকা গ্রহণের সময়, তারা বিশ্বাস রাখের আল্লাহ তা’আলাই মানুষকে মাধ্যম বানিয়ে তাদেরকে দান করছেন। টাকা প্রদানের সময়ও তারা বিশ্বাস রাখেন প্রাপ্তদের জন্য আল্লাহ তা’আলাই তাদেরকে মাধ্যম বানিয়েছেন।

এই মাক্বামের মর্যাদার ক্ষেত্রে শায়খ ও খাদিমের হালের মধ্যে সামঞ্জস্য বিদ্যমান। এ ক্ষেত্রে খাদিম ও শায়খের মধ্যে বিশেষ কোনো পার্থক্য নির্ধারিত হয় নি। তবে পার্থক্য যা তাহলো:

খাদিমের মাক্বাম ‘আবরার’ (সাধু) পর্যায়ে।
শায়খের মাক্বাম ‘মুকাররাব’ (নৈকট্যশীল) পর্যায়ে।

খাদিমী পছন্দের পেছনে খাদিমের উদ্দেশ্য হচ্ছে পরকালের প্রশান্তি। অন্যথায় খাদিমকে খাদিমী গ্রহণ করার কোনো বাধ্যবাধকতা নেই।

৪. ’উববাদ: এরা সর্বদা ইবাদতে মশগুল থাকেন। জিকির-আজকার ও নফল নামাযের প্রতি তাদের বিশেষ আকর্ষণ থাকে। পরলোকের প্রতিদান পাওয়ার আশায় তারা খুব নিষ্ঠাবান।

সুফিদের মধ্যেও উপরোক্ত গুণাবলী বিদ্যমান। তবে তাঁদের মধ্যে অতিরিক্ত যে জিনিসটি আছে তাহলো, আকাঙ্ক্ষার দূষণ থেকে তারা মুক্ত। কারণ তারা প্রভুর উপাসনা করেন শুধুমাত্র প্রভুর জন্য। তাদের উপাসনার উদ্দেশ্যের মধ্যে পরলোকের প্রতিদানের কোনো ইচ্ছে নেই।

’উববাদ ও জুহহাদের মধ্যে পার্থক্য হলো:

জাগতিক আকাঙ্ক্ষা থাকাসত্ত্বেও উক্তরূপ ইবাদত সম্ভব।

’উববাদ ও ফুকারা’র মধ্যে পার্থক্য হলো:

ধন-সম্পদ থাকাসত্ত্বেও কেউ ‘আবিদ হতে পারে।

তাহলে এটাই সুস্পষ্ট হলো যে:

১. ‘ওয়াসিল’ (আল্লাহ-সম্পৃক্তদের) তিনটি দল আছে।
২. ‘সালিক’ (পবিত্র রাস্তার ভ্রমণকারী) ছয়টি দল আছে।

উপরোক্ত নয়টি দলের প্রত্যেকটির মধ্যে দুটি সামঞ্জস্যতা বিদ্যমান:

১. তারা 'মুহিক্ব' (সত্যানুসারী)।

২. তারা 'মুবতিল' (মিত্যানুসারী)।

উভয় দলের নবীদের কাছে 'মুহিক্ব' ব্যক্তিরা হচ্ছেন:

তরীকতের মাশাইখে কিরাম ও উলামায়ে সুফিয়্যাহ। উভয় দলই মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইত্তিবার মাধ্যমে মানুষকে আল্লাহর নৈকট্যশীল বান্দায় পরিণত হতে দাওয়াত ও সাহায্য করেন।

মুবতিল দলের লোকদের বৈশিষ্ট্য হলো:

অপরের চরিত্রহননের জন্য মিথ্যা অপবাদ দেওয়া ও নবুওতী দাবী করা। তারা ওহিপ্রাপ্তির মিথ্যা দাবীদার। এদেরকে 'মুতানাব্বী' (যে নবুওয়াতের দাবী করে) বলে। মৃত্যুর পূর্বমুহূর্তে অনুসারীদের মস্তিষ্কে মিথ্যা আকাঙ্ক্ষার পক্ষি ডিম পেড়ে যেতে ইচ্ছাপোষণ করে। কিন্তু অবশেষে, বিপর্যয়ের ঝড়ে তাদের মস্তক খণ্ড-বিখণ্ড হয়। তারা ঘুরে ঘুরে জাহান্নামে নিমজ্জিত হয়।

সুফিদের নিকট 'মুহিক্ব' ব্যক্তির সাদৃশ্য হচ্ছে:

এরা মুতাসাওয়িফা, যারা অত্যন্ত জ্ঞানবান এবং সুফিদের 'হাল' এর প্রতি আকর্ষিত।

সুফিদের নিকট 'মুবতিল' ব্যক্তির সাদৃশ্য হচ্ছে:

একটি জামা'আত, যাঁরা জীবনে সূফি হিসেবে নিজেদেরকে জাহির করে। বাস্তবে এরা ঈমানহীন, আমলহীন এবং হালহীন। তারা নিজেদেরকে ঈমান-আমলের বাধ্যবাধকতা থেকে মুক্ত করে নিয়েছে। এরা উদ্দেশ্যহীনভাবে ময়দানে ঘুরে বেড়ায়। তারা বলে:

> শরীয়ত অনুসরণ করা হচ্ছে সাধারণ লোকদের কাজ, যাদের দৃষ্টি শুধুমাত্র বাইরের দিকে নিবদ্ধ। বিশেষ দল ও 'হাক্বিকাতের' অধিকারী লোকদের

'হাল' সাধারণ্যের থেকে অনেক উর্ধ্বে। সাধারণ লোক বাহ্যিক ধার্মিকতা নিয়ে ব্যস্ত, সুতরাং আভ্যন্তরীণ বিষয়াদি অবলোকন করা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়।

বাস্তবে এরাই হচ্ছে: ১. বাতিনিয়া ও মুবাহিয়া নামক বাতিল দল।

'মাজযূবান-ই-ওয়াসিল' (একত্রিত আকর্ষিতজন) ও মুহিব্ব ব্যক্তিদের মধ্যে সাদৃশ্য হচ্ছে:

এরা হচ্ছেন সুলুকের রাস্তায় ভ্রমণকারী দল। এরা নফসের বিভিন্ন স্তর অতিক্রমণ করছেন। এরা আকাঙ্ক্ষার আকুলতাকে জ্বালিয়ে দিয়েছেন। তারা সর্বদা অস্থির ও চিন্তাযুক্ত।

'ফানা'র মাক্বামে, 'জাত' এর উদয়ের সুখবর প্রকাশের পূর্বে; স্থিতিশীলতা ও স্থায়িত্ব লাভের আগে- ক্ষণে ক্ষণে হাক্বিকাতের নূরের স্ফুলিঙ্গ চমকে ওঠে অন্তরদৃশ্যে। আর 'ফানা'র মৃদু বাতাস-স্থান থেকে এককত্বের একটি শ্বাস এসে একত্রিত হয় হৃদয় মাঝে।

সুতরাং, বজ্রপাতের আলোর ঝলকে তাদের নফসে আম্মারার আঁধারে পড়ে যায় ভাঁজ। উষ্ণতা হেতু তাদের হৃদয় থেকে ঐ শ্বাসের বুদ্বুদ সৃষ্টি করে অনুসন্ধান, আলোড়ন, আত্মার শওক এবং অস্থিরতার অগ্নি।

যখন এ বর্জপাত শেষ হয় এবং ঐ শ্বাস থেমে যায়- নফসের গুণাবলী, আকাঙ্ক্ষার উষ্ণতা, অস্থিরতা ও শওক এর প্রকাশ ফিরে আসে। তখন পবিত্র রাস্তার ভ্রমণকারী স্বীয় গুণাবলীর বস্ত্রাবৃত অবস্থা থেকে পুরোপুরি মুক্ত হয়ে যেতে হৃদয়ে তীব্র আকাঙ্ক্ষা অনুভব করে। সে চায় 'ফানা'র সাগরে নিমজ্জিত হতে; যাতে করে, সে নিজের অস্তিত্বকে ধ্বংস করা থেকে বেঁচে থাকতে পারে।

উক্ত মাক্বামের অধিকারী হয়ে গেলে তার নাম হবে '**মাজযূব**'।

ভণ্ড '**মুবতিল**' (বাতিল- মিথ্যাবাদী) দল বলে থাকে: আমরা ফানা'র সাগরে নিমজ্জিত আছি, তাওহিদের নির্যাসে নিজেদেরকে বিলীন করেছি৷ নিজেদের যাবতীয় নড়াচড়া নিজেরা করা থেকে আমরা মুক্ত৷ আমাদের নড়াচড়া একটি দরোজার নড়াচড়ার মতো৷ দরোজা কোনো নড়াচড়াকারী ছাড়া নড়ে না৷

এসব ব্যাপার সত্য হলেও এই দলের 'হাল' মোটেই সে পর্যায়ে পৌঁছুয় নি৷ বাস্তবে এদের উদ্দেশ্য হচ্ছে:

১. গুনাহের জন্য ওজর সৃষ্টি করা৷

২. গুনাহকেও আল্লাহর ইচ্ছার সাথে সম্পৃক্তকরণ৷

৩. নিজেদের দোষ-ত্রুটিকে অস্বীকার করা৷

এই দলকেই বলা হয় '**জানাদিক্বাহ**' (ঈমানহীন) - একবচনে '**জিন্দিক**'। এরা সাহল ইবনে আবদুল্লাহ তুসতারী রাহিমাহুল্লাহর নিকট এসে বললো:

> "এক ব্যক্তি বলে, আমার আমল আল্লাহর ইচ্ছার ওপর ঐরূপ নির্ভরশীল যেরূপ নির্ভরশীল কোনো দরোজার গতি নড়াচড়াকারীর ওপর৷"

তিনি (তুসতারী রাহিমাহুল্লাহ) বললেন:

> "যদি এই বক্তা শরীয়তের পূর্ণাঙ্গ অনুসারী হয়ে থাকে এবং সঠিক আমল করে- তাহলে সে সিদ্দীক৷ আর যদি সে শরীয়তের আইনের বিপরীতে অবস্থান করে এবং ধ্বংস হয়ে যাওয়ার ভীতি তার মধ্যে না থাকে, যা সে বলে তার দ্বারা উদ্দেশ্য হয় নিজের দোষ-ত্রুটি আল্লাহর ইচ্ছার ওপর ছেড়ে দেওয়া, তাহলে সে মু'মিন থাকবে না- জিন্দিক হয়ে যাবে৷"

আল্লাহ তা'আলা সবাইকে সঠিক তরীকতের রাস্তার ওপর দৃঢ় রাখুন৷ রক্ষা করুন ভণ্ড পীর, জিন্দিক, পথভ্রষ্ট, প্রতারক, দুনিয়াদারদের খপ্পর থেকে৷ আমীন৷

.... সমাপ্ত ....